পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০২: শিক্ষার্থী উন্নয়ন

শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ
(তথ্যপুস্তক)

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ (তথ্যপুস্তক)

লেখক

মাহবুবুর রহমান
নাহিদ পারভীন
রিফফাত জাহান নাহরীন
সীমা রানী সরকার
মোস্তাক ইমরান

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-প্রধান সমন্বয়ক

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদক

মো: মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ
উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক

রেজিনা আকতার
শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম সমন্বয়ক

মো: দুলাল মিয়া, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মুখবন্ধ

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সবসময় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। অর্থাৎ শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় করা আবশ্যক।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য কিংবা কার্যকর শিখনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষক। কিন্তু দেখা যায়, শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই একজন শিক্ষকের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

শিশুর বিকাশ, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচলিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) এর পাশাপাশি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটিও চলমান রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল কাজ হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন করা। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমের যেমন ব্যাপক পরিমার্জন হয়েছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ইতোপূর্বে প্রণীত ডিপিএড কোর্সের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা বিষয়ের প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং ১৫ দিন ব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকগণের ইন্ডাকশন প্রশিক্ষণের ম্যানুয়ালের সমন্বয় করে এই মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই মডিউলে বয়সভেদে শিশুর আচরণ, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ, শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র, শিশুর শিখনের ক্ষেত্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিখন, শিশুর অধিকার, শিশুর আচরণ ব্যবস্থাপনা, শিশুর সার্বিক বিকাশে শিক্ষকের করণীয়, প্রতিষ্ঠান ও অংশিজনের ভূমিকা, শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা, শিশুর বিকাশে খেলার ভূমিকা, শিশুর আবেগ ব্যবস্থাপনা ও আত্মপরিচর্যা ইত্যাদি বিষয় ও শিখন শেখানো কৌশলের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রথমে বিষয়বস্তুগত ধারণা এবং তারপর পাঠের ধরন অনুযায়ী পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নে ও উন্নয়নে যাঁরা অতি অল্প সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউলটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। এ প্রশিক্ষণ মডিউলটি উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসকল সংস্থা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে এই মডিউলটি নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক প্রশিক্ষণ) কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ক মডিউলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়স্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোনও উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মডিউলটি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের পর তা শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের ওপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে এর পরিমাপ বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মডিউলটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউলটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের বিষয়াদি সংযোজন ও সংশোধন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে শিক্ষার্থী উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ মডিউল পরিচিতি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) যে কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুসারে শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিপরীতে মোট ১৯টি অধিবেশন রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য ১.৩০ ঘণ্টা সময় বিভাজন করা হয়েছে। মডিউলের প্রথম দিকে একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে অধিবেশনের শিরোনাম, শিখনফল, কাজ, পদ্ধতি-কৌশল ও ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতি ও কৌশল:

শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ সম্পর্কে জেনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিকাশ ও শিখনতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণার পরিবর্তে এক্টিভিটি বেজড প্রায়োগিক উদাহরনের অবতারনা করা হয়েছে। শিখন শেখানো কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে শিশু কেন্দ্রিক খেলা অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ উপস্থাপন, প্রদর্শন ও আলোচনা, মাইন্ড ম্যাপিং, মাইক্রোটিচিং, ব্রেইন-স্টর্মিং, তথ্যপত্র উপস্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্য:

শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিশুর শিখন আচরণ সম্পর্কে অবগত হয়ে শিক্ষকগণের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন শেখানো কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো-

১. শিশুর বিকাশ এবং শিখন আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধির বিকাশ ও প্রয়োগ সাধন করা;
২. শিক্ষার্থীদের শেখার দক্ষতা বিকাশের কৌশল অনুশীলন করা;
৩. শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতাগুলো অর্জন করানোর কৌশল আয়ত্ব করা;
৪. শিশুর বিকাশে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমগুলো অনুশীলন করা;
৫. শিশুর বিকাশে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের ভূমিকা নিশ্চিত করা;

৬. শিশুর আবেগ ব্যবস্থাপনা ও আত্মপরিচর্যার কৌশল অনুশীলন করা।

সূচিপত্র

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	শিশু এবং বয়সভেদে শিশুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্য	১-৪
২	শিশুর চাহিদা, শিশুর অধিকার, চাহিদাপূরণে প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণ কৌশল	৫-১১
৩	শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ	১২-১৫
৪	শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা এবং শিশুর বিকাশ ও যত্নে করণীয়	১৬-১৯
৫	শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্ব ও করণীয়	২০-২৪
৬	শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা	২৫-২৬
৭	শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার ধরণ অনুযায়ী শিখন আচরণে করণীয়	২৭-৩১
৮	শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ এবং শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া ও শিক্ষকের করণীয়	৩২-৩৭
৯	শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক-আবেগিক বিকাশ প্রক্রিয়া ও শিক্ষকের করণীয়	৩৮-৪২
১০	শিশুর বিকাশ ও শিখনে খেলার গুরুত্ব এবং শিক্ষকের করণীয়	৪৩-৪৬
১১	শিশুর বিকাশে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম	৪৭-৫১
১২	শিশুর বিকাশে খাদ্যাভ্যাস	৫২-৫৮
১৩	শিশুর বিকাশ ও শিখনে প্রেষণার গুরুত্ব এবং শিক্ষকের করণীয়	৫৯-৬২
১৪	শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যতার কারণে শিশুর বহুমূখী বিকাশ	৬৩-৬৬
১৫	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর পরিচয় এবং তাদের শিখন চ্যালেঞ্জ	৬৭-৭৬
১৬	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর আচরণ ব্যবস্থাপনা	৭৭-৮২
১৭	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের ভূমিকা	৮৩-৮৬
১৮	শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে খেলার ভূমিকা	৮৭
১৯	শিশুর আবেগ ব্যবস্থাপনা ও আত্মপরিচর্যা	৮৮-৯২
তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ		৯৩-৯৭

অধিবেশন-১	শিরোনাম: শিশু এবং বয়সভেদে শিশুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্য

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বয়সভেদে শিশুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্য তুলনা করতে পারবেন।

শিশু ও শিশুর বৈশিষ্ট্য — সহায়ক তথ্য-১

অংশ-ক

শিশু: জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিশু নীতিমালা অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়। প্রতিটি শিশু আলাদা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা। শিশুর রয়েছে নিজস্ব একটা জগৎ এবং শিশুর এই জগৎ হলো হাসি ও আনন্দময়। শিশুদের সঠিকভাবে বুঝতে এবং সক্রিয় রাখতে হলে তাদের সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। শিশুর শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রত্যেক শিক্ষক মেন্টরের জন্য অত্যাবশ্যক।

শিশুদের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য হলো-

→ প্রতিটি শিশু এক নয়। প্রত্যেক শিশুই অপর শিশু থেকে আলাদা।

→ শিশুদের পছন্দ, চাহিদা ও শিখনের ধরন আলাদা আলাদা হয়, যা মূলত গড়ে ওঠে তার বেড়ে ওা পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।

→ শিশু আদর ও ভালোবাসা পেতে এবং বড়দের কাছে গ্রহণীয় হতে চায়।

→ শিশুরা অনুসন্ধিৎসু হয়। ফলে তারা নানা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে।→ নানা রকম কাজ, অভিজ্ঞতা ও কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করতে পছন্দ করে।

→ শিশু নিজের মত করে পৃথিবীকে দেখে, বড়দের মত করে নয়। তারা কল্পনা প্রবণ। শিশু কল্পনা এবং বাস্ড়বের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা।

→ শিশু নিজেকে হাতি, ঘোড়া, ভালুক, প্রভৃতি কল্পনা করে। খেলার ভিতর দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের উপর নানা রকম অভিজ্ঞতা যুক্ত করে।

→ নানা রকম রূপকথার গল্প, ছেলে ভুলানোর ছড়া ইত্যাদি শুনতে খুবই ভালোবাসে। এগুলো শিশুর কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে।

→ শিশু তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বোঝার চেষ্টা করে। অন্যের কাজকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে।

→ বিশ্ব জগতের অধিকাংশ সামগ্রীকে সে জীবন্ড় মনে করে, কারণ অন্যান্য প্রাণি ও বস্তুর মধ্যে সে নিজের মনের অনুভূতি ও আবেগ আরোপ করে।

→ সাধারণত কোনো কিছুতে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।

→ খেলে এবং নানারকম কাজ করে শেখে।

→ আত্মকেন্দ্রিক হয়। তার চিন্ড়া-ভাবনা নিজেকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

→ সহজে ভাষা আয়ত্ব করে।

→ আমিত্ববোধের সৃষ্টি হয়।

→ প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতিনীতির ও সংস্কারের প্রতি সাধারণ বিশ্বাস ও আনুগত্যের সঞ্চার হয়।

→ বয়ঃসন্ধিকালে অন্যের সঙ্গে নিজের মনোভাবের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যার ফলে মনে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি হয়।

→ শিশুরা চঞ্চল ও প্রাণবন্ড়। তাই ছুটাছুটি, লাফ-ঝাপ, দাপাদাপি অধিক পরিমাণে করে।

→

→ শিশু তার স্বভাবসুলভ কারণেই চারপাশের পরিবেশকে আবিষ্কার করতে চায়। পরিবারের সীমান ছাড়িয়ে বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে এবং বন্ধু বান্ধবের দলে নেতৃত্ব দান করে। ফলে সে বহির্মূখী জীবনের স্বাদ পায়।

→ শিশুরা আনন্দপ্রিয় হয়। তারা নানা আনন্দজনক কাজ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে ও যুক্ত হতে পছন্দ করে।

→ খেলা ও খেলনা বেশি পছন্দ করে। খেলাই শিশুর প্রধান কাজ এবং খেলার মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে।

→ শিশুরা কৌতুহলী হয়। তার স্বভাবসুলভ কারণেই বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন করে জানার ও বোঝার চেষ্টা করে।

→ অনুকরণ প্রিয়। তারা তাদের চারপাশের বড়দের ও সঙ্গীদলের সদস্যদের অনুকরণ করে শিখে। ।

অংশ-খঃ বয়সভেদে শিশুর বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় সব শিশুই প্রাকৃতিক নিয়মে একটি নির্দিষ্ট বয়সে বসে, দাঁড়ায়, হাঁটে, কথা বলে। খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটে। শিশুরা একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে এক একটি দক্ষতা অর্জন করে। দক্ষতা অর্জনের সময়সীমাকে বিকাশের মাইলফলক বলে। যেমন- দেড় মাসে শিশু হাসি দিতে শেখে, ৬ মাসে সাহায্য নিয়ে এবং ৯ মাসে সাহায্য ছাড়া বসতে পারে, ৯/১০ মাসে হামাগুড়ি দেয়, ১২-১৪ মাসে হাঁটে, ২ বছরে ভালোভাবে/স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারে ইত্যাদি। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বৈশিষ্ট্য, শিখন এবং বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশুর জীবনচক্র বয়স অনুসারে বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি স্তরকে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরেরই রয়েছে কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যা বয়সভেদে শিশুরা ঐ নির্দিষ্ট দক্ষতা বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। শিশুর জীবনের একেকটি স্তরের দক্ষতা ও বিকাশ পরবর্তী স্তরের শিক্ষা ও বিকাশের ভিত রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, কোনো একটা স্তরের বিকাশের ধারা কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হলে তা পরবর্তী স্তরের দক্ষতা ও বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। এভাবেই শিশুর জীবনে ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটতে থাকে যা বয়সের সাথে সাথে পরিপূর্ণতা পায়। পূর্বের স্তর পার না করে সাধারণত শিশু পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন– কোনো শিশু হাঁটা না শিখে দৌড়াতে পারে না, বা বলা যায় হাঁটা ভালোভাবে না শিখে কেউ ভালোভাবে দাঁড়াতে পারে না। শিশুর জীবনের বিভিন্ন বয়ঃক্রমে তাদের বৈশিষ্ট্য, পছন্দ, চাহিদা ও প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। আবার, নির্দিষ্ট একটি বয়সে সকল শিশুর আচরণে বিশেষ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য (মিল) দেখা যায়। এক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া, বিভিন্ন দেশের শিশুদের মধ্যে মোটামুটি একই ধারাক্রম অনুযায়ী বিকাশ ঘটে থাকে। সাধারণত একটি শিশু তার সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে না কি পিছিয়ে আছে তা বিকাশের মাইলফলক দেখে বুঝা যায়।

মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে যা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এগিয়ে চলে। সামগ্রিকভাবে জীবন বিকাশের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বয়স ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। কিন্তু এই বিভাজনে বেশ মতবিরোধও রয়েছে। সাধারণত ভ্রুণাবস্থা থেকে প্রারম্ভিক শিশুকাল শুরু হয় তবে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অন্যন্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শিশুকাল বা শৈশবকে কয়েকটি ছোটো ছোটো পর্বে ভাগ করা হয়; যেমন- প্রারম্ভিক শৈশব, শৈশব ও কৈশোর। যেহেতু আমরা প্রাথমিক স্তরের শিশুদের সাথে কাজ করব, তাই প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালে শিশুর বিকাশ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো।

প্রারম্ভিক শৈশব (Early Childhood): পৃথিবীর প্রায় অনেক দেশেই প্রারম্ভিক শৈশব বলতে গর্ভ থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। বাংলাদেশে 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩' অনুযায়ী প্রারম্ভিক শৈশবকাল গর্ভ থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে মূলতঃ ভ্রুণাবস্থা থেকে ৫ বছর- জীবনব্যাপি শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তি গঠনের সাথে সম্পৃক্ত এবং ৬-৮ বৎসর- শারীরিক

বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় সহজ ও সাবলীল উত্তরণের সাথে সম্পৃক্ত।

এই সময়ে শিশু লম্বা ও ক্ষীণকায় হয়। হাঁটা, দৌড়ানো, খেলাধুলা করা, ধরা ইত্যাদিতে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করে। তারা নিজের কাজগুলো করতে পারে। যেমন- নিজে খাওয়া, পোশাক পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া।এছাড়া, তারা স্ত্রী পুরুষের বিদ্যমান পার্থক্য করতে শিখে। তারা পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করে। সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করে। এ বয়সে তারা কৌতুহলী হয় ও অনেক প্রশ্ন করে।

শৈশবকাল (Middle Childhood): সাধারণত প্রাক-কৈশোর থেকে যৌবনাগমন (Adolescence) এর পূর্ব পর্যায়টিকে ধরা অর্থাৎ শিশুর ১১ বছর বয়স সীমাকে বুঝানো হয়।

এই সময় শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। বর্হিজগতের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ট হয়। এই বয়স হলো দল গঠন করার বয়স। লেখাপড়া ও গণনার মৌলিক দক্ষতা অর্জন করে। তারা সৃজনশীল কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকতে আনন্দবোধ করে এবং ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে। লিঙ্গ অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা পালন শিখে।

অধিবেশন-২	শিরোনাম: শিশুর চাহিদা, শিশুর অধিকার, শিশুর চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণ কৌশল

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর চাহিদা এবং অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর চাহিদা ও অধিকার পূরণে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিশুর চাহিদা ও অধিকার পূরণে প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিশুর চাহিদা ও অধিকার এবং শিশু অধিকার সনদ — সহায়ক তথ্য-২

অংশ-ক:

ক-১: শিশুর চাহিদা

একটি শিশু যা কিছুর অভাববোধ করে বা যা কিছু পেতে ইচ্ছা জাগে, সেটাই তার চাহিদা। শিশু এই সময় সর্বদা তার পিতা-মাতার সাথে থাকতে চায়। কেননা তাদের কাছেই সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এটা তার নিরাপত্তার চাহিদা। শিশুর মাঝে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা দেখা যায়: জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদা।

জৈবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে-খাদ্যের চাহিদা, ঘুমের চাহিদা, প্রাতকর্মের চাহিদা, ইত্যাদি।

মানসিক চাহিদার মধ্যে আছে- আত্ন-প্রতিষ্ঠার চাহিদা, কল্পনার চাহিদা, ইগোকে পুষ্ট করার চাহিদা, বুদ্ধি বিকাশের চাহিদা, আত্নতৃপ্তির চাহিদা, জানার চাহিদা, আধিপত্যের চাহিদা, অনুকরণের চাহিদা ইত্যাদি।

সামাজিক চাহিদার মধ্যে আছে প্রশংসা পাওয়ার চাহিদা, সম্মানের চাহিদা, নেতৃত্বের চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা,ভালোবাসা পাওয়ার চাহিদা, অপরকে ভালোবাসার চাহিদা, স্বীকৃতির চাহিদা, খেলার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, পুনরাবৃত্তির চাহিদা, অস্তিতের চাহিদা, সাফল্যের চাহিদা, ক্ষমতার চাহিদা, অধিভুক্ত হওয়ার চাহিদা, কার্যসম্পাদনের চাহিদা, প্রতিক্রিয়ার চাহিদা, প্রার্থনা করার চাহিদা, অনুকরণের চাহিদা, জানার চাহিদা , দলবদ্ধ হওয়ার চাহিদা, সহযোগিতার চাহিদা ইত্যাদি।

শিশু তার চাহিদা পূরণে যদি তৃপ্ত না হয়, তখন অনেক সময় সে আক্রমণাত্মক আচরণ করে। এসব চাহিদাপূরণে অতৃপ্তিতে ভবিষ্যতে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষে পরিণত হয়।

ক-২: শিশু অধিকার

শিশুদের অনেক কিছুর চাহিদা রয়েছে। বড়দের মতো তার রয়েছে শারীরিক চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, ভালোবাসা ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চাহিদা। তবে কিছু কিছু চাহিদা আছে যা শিশুর বেঁচে থাকার জন্য, নিরাপদভাবে বসবাসের জন্য, সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশুর এ সকল আবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। এ সকল প্রয়োজনীয় চাহিদাকে শিশুর অধিকার বলা হয়। শিশুর অধিকার হলো শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় এমন সব সুযোগ-সুবিধা যা রাষ্ট্র কতৃক স্বীকৃত। শিশুর মৌলিক অধিকার হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। শিশুর তিন ধরনের সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে: আইনগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়/নাগরিক। শিশুর অধিকার সনদের মূলনীতি: বৈষম্যহীনতা, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ, বেঁচে থাকা ও বিকাশের নিশ্চয়তা, অংশগ্রহণ, দায়বদ্ধতা।

শিশুর অধিকারগুলোকে বিবেচনায় রেখে শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু অধিকার সনদটি ১৯৮৯ সালে নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের অংশ হিসেবে পরিণত হয়। সমাজের সর্বস্তরে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের কথা বিবেচনায় রেখে শিশুর অধিকারগুলোকে শিশু অধিকার সনদে ৫৪টি ধারায় রাখা হয়েছে। এই ধারাগুলোকে মূলত পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

বেঁচে থাকার অধিকার: শিশুর মৌলিক অধিকারের মধ্যে যেসব চাহিদা শিশুর বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন সেগুলোকে বেঁচে থাকার অধিকার বলে। যেমন- সন্তোষজনক জীবনমান, নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা ইত্যাদির অধিকার।

সুরক্ষার অধিকার: নানা রকম বৈষম্য, অবহেলা, নিপীড়ন এবং হত্যার মতো জঘন্য অবস্থা থেকে শিশুদের রক্ষা পাওয়ার অধিকারসমূহ এই অধিকারগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে।

বিকাশের অধিকার: যে সমস্ত অধিকার শিশুর সার্বিকভাবে বেড়ে ওঠায় সহায়তা করে সে সমস্ত অধিকারসমূহ বিকাশের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- শিক্ষা, খেলাধুলা, বিশ্রাম, চিন্তা, বিবেক, তথ্য ও জ্ঞানলাভ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের অধিকার ইত্যাদি।

অংশগ্রহণের অধিকারঃ শিশুদের স্বাধীনভাবে কথা বলার, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশে যোগদান এবং দলবদ্ধ হওয়ার অধিকার এই ভাগের মধ্যে রয়েছে।

সমাবেশীকরণের অধিকারঃ শিশুদের অধিকার আদায়ের জন্য সমাজের সবার সচেতনতা ও দায়িত্ব পালনে অংশ নেওয়া দরকার। তাই শিশুর পরিচিতি শনাক্তকরণসহ সমাজে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন, নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ, সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া, বাস্তবায়নে অর্থ-সম্পদ যোগান ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা ও তথ্যসমূহ এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত, শিশুর অধিকার রক্ষার দায়িত্ব কোনো সরকারের একার নয়। এ দায়িত্ব শিশুদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত সকলের। তাই শিশুর অধিকার বাস্তবায়ন জন্য কী করতে হবে, কারা কারা করবেন, কীভাবে করবেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে ধারাগুলো রয়েছে তা সমাবেশীকরণের অধিকার গুচ্ছে রয়েছে।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার সম্পর্কিত সংসদীয় ককাস গ্রুপ রয়েছে। এটি নির্দলীয়, সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি গ্রুপ যা বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত শিশু অধিকার রক্ষা ও শিশু সুরক্ষার জন্য কাজ করে।

ক-৩ঃ শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে চাহিদা

- জন্মের পরই শিশু দ্রুত শিখতে শুরু করে। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বড়দের ভালোবাসা ও মনোযোগ।
- শিশুর বিকাশে শিশুর জন্য খেলাধূলা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।
- মা, বাবা ও স্কুলের শিক্ষক শিশুর খেলায় সাহায্য করতে পারে।
- শিশু অল্পেই জেদ করে, ভয় পায়, সুতরাং খুব ধৈর্য ও সহানুভূতি নিয়ে তার আবেগ অনুভূতির প্রতি সাড়া দিলে সে সুস্থ মন ও মানসিক ভারসাম্য নিয়ে বড় হয়ে ওঠে।
- শিশু ঘন ঘন বড়দের কাছ থেকে উৎসাহ ও সম্মতি পেতে চায়।
- যেকোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি তার বিকাশের অন্তরায়।
- শিশু বড়দের অনুকরন করে, সুতরাং বড়রা এমন কোন আচরন তার সাথে করবেন না যাতে সে খারাপ আচরণটি দেখে নিজের মাঝে আত্নস্থ করে নেয়।
- শিশুর বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক মা-বাবা ও শিক্ষক।
- শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতেই তার স্কুল জীবনের সুশিক্ষার ভিত তৈরি হয়। সুতারাং এদিকটাতেও নজর রেখে তার বিকাশের ভিত্তি তৈরি করতে হবে।
- শিশুর চাহিদাগুলো তার বিকাশের সহায়ক, এই সহায়তা মা-বাবই দেবেন।

তথ্যসূত্রঃ http://breakingthesilencebd.org/childrenneed.html

অংশ খঃ শিশুর চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

প্রতিবন্ধকতা	নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জ	সম্ভ্যাব্য সমাধান
১. বেঁচে থাকায় ২. সুরক্ষায় ৩. বিকাশগত ৪. অংশগ্রহন ও সমাবেশীকরণে বাঁধা ৫. পুষ্টিজনিত ৬. আর্থ-সামাজিক ৭. পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত অবস্থা ৮. ঋতুভেদগত তারতম্য ৯. ক্রনিক ব্যাধি ১০. আবেগীয় ট্রমা ১১. লিঙ্গ ভিন্নতা ১২. পরিবারে শিশুর অবস্থান ১৩. অন্তক্ষরা গ্রন্থিগত প্রভাব ১৪. জ্ঞাতি ও সংস্কৃতি ১৫. মানসিক প্রভাব সংশিষ্ট উপাদান সামাজিকীকরণ সংশিষ্ট উপাদান	= সমাজ সচেতন নয়, শিশুদের পরিবার সচেতন নয়, পরিবারের আর্থিক অক্ষমতা, শিশু শ্রম, নির্যতন, যথাযথ পুষ্টিকর খাবারের অভাব, শারীরিক সমস্যা, ইত্যাদি। = যাদের দ্বারা শিশুরা সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকার কথা, তাদের হাতেই বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শিশু প্রতিনিয়ত সহিংসতা, ভৎসনা এবং শোষণের শিকার হয়। প্রতি ১০ জনের মধ্যে নয়জন শিশুই তাদের বাবা-মা এবং শিক্ষক সহ সেবাদানকারীদের দ্বারা শারীরিক শাস্ড়ি বা মানসিক আগ্রাসনের শিকার হয়। = বাংলাদেশে অনেক শিশুই সময়ের আগেই বড় হয়ে যেতে বাধ্য হয়। নিজেদের পরিবারের বেঁচে থাকার কৌশলের অংশ হিসেবে অনেক কিশোর-কিশোরীকে প্রায়ই কাজে পাঠানো হয় বা তাদের অপরিণত বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রায় সাত শতাংশ শিশু কোনো না কোনো ধরনের শিশুশ্রমে জড়িত। এছাড়াও খুব অল্পবয়সী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা অব্যাহত রয়েছে। = বাল্যবিবাহের বির“দ্ধে আইন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। বাইশ থেকে ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি নারীর অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যকের (৫১ শতাংশ) তাদের ১৮তম জন্মদিনের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। = বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভাধারণ মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য গুর“তর সমস্যা এবং এটি তাদের স্বাস্থের ক্ষেত্রে আজীবন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেসব মেয়েদের বাল্যকালে বিয়ে হয়, তাদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। তারা অপুষ্টিতে ভোগে, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালীন জটিলতার কারণে অনেকেই অকালে মারা যায় এবং পরিণত বয়সে বিয়ে করা মেয়েদের তুলনায় বাড়িতেও তাদের বেশি	= সমাজ, পরিবারকে সচেতন করে তোলা = দরিদ্র পরিবারগুলোকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। = প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা দেয়া ইত্যাদি...

	সহিংসতার সম্মুখিন হতে হয়। = লাখ লাখ শিশুর মাথার ওপর ছাদ নেই। তারা রাস্তায় বসবাস করে ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিশুদের আরেকটি অংশ প্রতিবন্ধীত্বের শিকার। এসব শিশুরা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং বৈষম্য, সামাজিক কলঙ্ক ও বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হয়। শিশু অধিকারের সংগ্রাম জন্মলগ্ন থেকেই শুর" হয়। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ৫৬ শতাংশ জন্মের সময় নিবন্ধিত হয়। এর অর্থ লক্ষ লক্ষ শিশু একটি পরিচয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ন্যায়বিচার পাওয়া তাদের আরেকটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে ১০২টি শিশু আদালত থাকা সত্ত্বেও কিশোর-কিশোরীদের জন্য যে বিচার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে ২৩ হাজারেরও বেশি মামলার এখনও নিস্পত্তি হয়নি।	

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ

- শ্রেণিকক্ষে উচ্চ মেধা, স্বল্প মেধা ও নিম্ন মেধা বা পিছিয়ে পড়া এ তিনধরনের শিক্ষার্থী থাকে। এরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে। কেউ ধনী কেউ আবার গরীব। তাদের বাসা বা বাড়ির পরিবেশও বিভিন্ন। তাই এদের অনেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিখনে এগিয়ে আসতে পারে না। কারণ বাসায় বা বাড়িতে পড়ার পরিবেশ ইতিবাচক নয়। পরিবারের পরিবেশগত চাহিদার অভাবে
- আবার কখনো কখনো দেখা যায় পরিবারের সদস্যদের অসচেতনতা, উদাসীনতার কারণে শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ছে। সহযোগিতার চাহিদার অভাবে
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সব শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না বলে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে।
- কোনো কোনো শিক্ষার্থীর ফাঁকি দেওয়ার মনোবৃত্তি আছে বলে তারা সব সময় পেছনের বেঞ্চে বসে এবং এদের মধ্যে শিক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে।
- বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন যোগ্যতম শিক্ষকের অভাবও শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম একটি কারণ।
- নিরক্ষর পরিবারে বেড়ে উঠা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের উদাসীনতা তাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম আরেকটি কারণ।
- শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো শ্রেণিকক্ষে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকা। শ্রেণিকার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের অনেকেই পাঠের সাথে পরিচিত হতে পারে না। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে।

- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত খোঁজ খবর না নেওয়ার কারণেও তারা বিদ্যালয় বিমুখ হয়।
- বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।
- অনেক সময় শারীরিক অসুস্তা ও নানারকম শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণেও শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে।
- আবার দেখা যায় কোন পরিবার অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। ফলে সেই পরিবারের সন্তানেরা সাধারণভাবেই শিক্ষা বিমুখ হয়ে পড়ে। দেখা যায় কোন কোন শিক্ষক শ্রেণিতে অমনোযোগী থাকেন। আবার সব শিক্ষক যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেন না। তাই অনেক শিক্ষার্থী এ সুযোগের নেতিবাচক সদ্ব্যবহার করে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এভাবে ক্রমেই শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে।
- বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া এবং অবস্থানের কোন কারণে শিক্ষার্থী মানসিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যা তাকে বিদ্যালয় বিমুখ করে তোলে।
- এছাড়া শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি থাকলেও শিক্ষার্থী উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং অবশেষে অনগ্রসর বা সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়।

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের উপায়

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিরূপিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য শিক্ষক অভিভাবক উভয়কে সচেতন হতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।
- শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ধরে বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে নিরাময়মূলক ক্লাশ নেওয়ার মাধ্যমে। যেমন- যে বিষয়গুলোতে দুর্বল সে বিষয়গুলো বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে এক থেকে দুই ঘণ্টা অনুশীলন, ক্লাশ চলাকালীন অনুশীলন, ক্লাশ শেষে অনুশীলন এবং একই বিষয়বস্তুর ওপর বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে কাজ প্রদানের মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী হওয়া সম্ভব।
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্তিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।
- পড়ার সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে সন্ধ্যা থেকে রাতে কয়টা পর্যন্ত কোন কোন বিষয় পড়বে। কোন বিষয় লিখবে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে,সন্ধ্যা থেকে অন্তত রাত দশটা পর্যন্ত বাসায় যাতে টেলিভিশন না চলে। এতে একাগ্রচিত্তে শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে।
- শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন রকমের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে সে নিজকে পড়া লেখায় আগ্রহী করবে এবং বিষয়বস্তুর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সমস্যার কথা অভিভাবক ও শিক্ষককে আন্তরিকতার সাথে শুনতে হবে এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে হবে।
- অবশ্যই অভিভাবককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

- প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন না থাকলে শিক্ষার্থীর হাতে মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি না দিলে শিক্ষার্থীর সময় নষ্ট হবে না। লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে। পিছিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।
- বিদ্যালয় প্রশাসন যদি যত্নবান থাকে তাহলে শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার কারণ নির্ণয় করে সেভাবে তাকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীও অগ্রসর হতে পারে।
- শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে সময় ব্যবস্থাপনা
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। ইত্যাদি।

শিক্ষকের করণীয়ঃ

- শিশুর চাহিদা অনুযায়ী গল্প বলা, বই পড়া, খেলাধুলা করা, আবৃত্তি করা ইত্যাদি।
- সকল শিক্ষার্থীকে সবক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষক এমন প্রশ্ন করেন যাতে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কথা প্রাধান্য দেয় এবং প্রশংসা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন এবং শিক্ষার্থীদের কাজ থেকে উত্তর নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভাবার সুয়োগ দেন।
- সকল শিক্ষার্থীদের কথা বলার/প্রশ্ন করার সুযোগ দিবেন।
- শিখন শেখানোর কাজে চাহিদার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো আসবাবপত্র পুণর্সজ্জিত করেন (যেমন জোড়ায় অথবা দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয় অথবা আলোচনার ক্ষেত্রে)।
- শিক্ষার্থীদের সাথে হেসে কথা বলেন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে সকল বিষয় খোলা মেলা আলোচনা করে।
- শিক্ষার্থীদের তাদের ভালো কাজ এবং আচরণের জন্য প্রায়ই প্রশংসা করে থাকেন।
- শিক্ষার্থী মধ্যে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করেন।
- শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ শ্রেণিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের তাদের ভাল কাজ এবং আচরণের জন্য প্রায়ই প্রশংসা করে থাকেন।

অধিবেশন-৩	শিরোনাম: শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমুহ কী কী তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ. শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ	সহায়ক তথ্য-৩

অংশ-ক: শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে। শিশুর পরিবর্তন প্রধানত দুইভাবে ঘটে। দৈহিক আকার আকৃতিতে শিশুর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে শিশুর বৃদ্ধি বলে। এই বৃদ্ধি বলতে বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ও আকারে বড় হওয়াকে বোঝায় যা পরিমানগত। মানব জীবনে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি সাধিত হয়।

অপরদিকে আচরণ, দক্ষতা, কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতাতে শিশুর যে পরিবর্তনসমূহ ঘটে তাকে শিশুর বিকাশ বলে। এই বিকাশ বলতে শিশুর শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা, সামাজিক ও আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ- এই চারটি ক্ষেত্রের বিকাশকে বোঝায়। তবে আকার আকৃতির মতো শিশুর বিকাশ সরাসরি দেখা যায় না, শিশুর পারা ও না পারার দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে এই পরিবর্তন বুঝা যায়। বিকাশ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে এবং তা জন্ম থেকে মৃত্যর পূর্ব পর্যন্ত চলতে পারে। ব্যক্তির ও সামাজিক অভিযোজনের সাথে বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত নয় কিন্তু বিকাশ ব্যাহত হলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিযোজন বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুর সার্বিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য বিকাশ ও বৃদ্ধি অপরিহার্য।

চিত্রঃ শিশুর পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

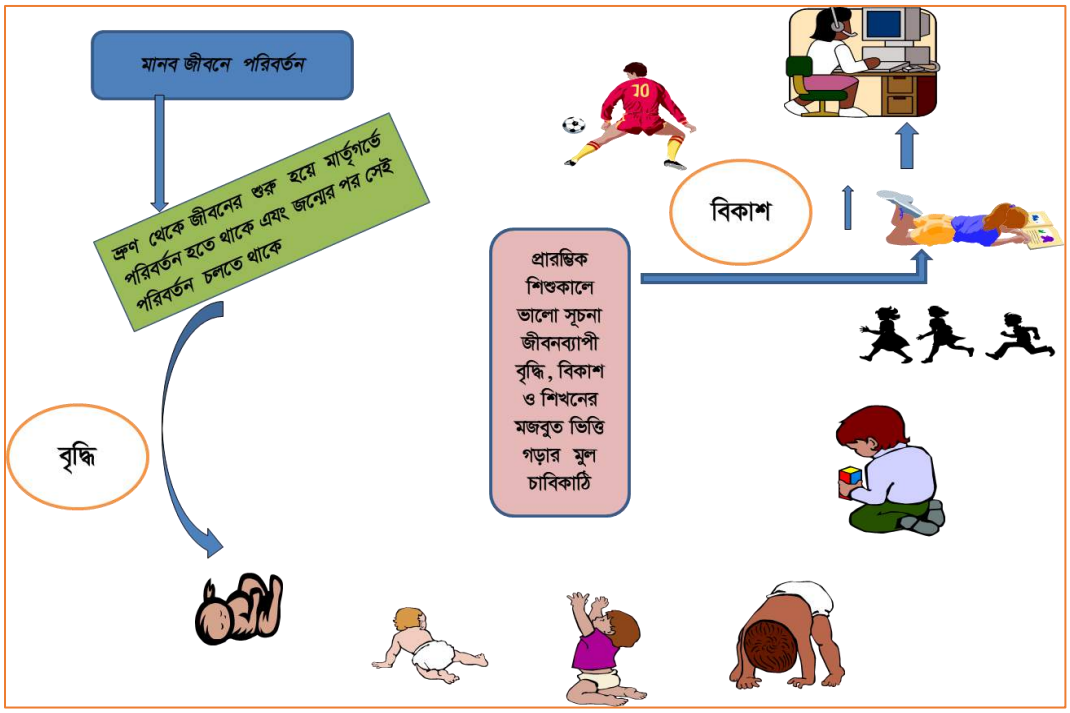

অংশ-খঃ শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রসমুহ

শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমূহঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ ও প্রারম্ভিক শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানদণ্ড নিরূপন করার জন্য 'প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ২০২০' (Early Learning and Development Standards-ELDS, 2020) প্রণয়ন করেছে। ELDS এ জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বয়সভিত্তিক আচরণ ও কাজ করার ক্ষমতার ক্রমবিকাশকে নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে।

শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতার বিকাশ (Physical and Motor Development): শারীরিক বিকাশ হলো শিশুর শারীরিক দক্ষতা ও সক্ষমতা যা শিশুর সুস্থ বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করে এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। যেমন- দৌড়ানো, লাফঝাপ ও ছুটাছুটি করে খেলার সময় শিশুর শারীরিক বিকাশ ঘটে থাকে।

সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ (Social and Emotional Development): সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ হচ্ছে শিশুর ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া (positive interaction) এবং ছোট-বড়দের ও সমবয়সিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি এবং বজায় রাখার জন্য শিশুর যোগ্যতা। যেমন- সমবয়সি ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকা, খেলাধুলা করা এবং সামাজিক রীতি-নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের উন্নয়ন হয়ে থাকে।

ভাষা ও যোগাযোগের বিকাশ (Language and Communication Development): ভাষার নিয়মকানুন বোঝার ও যোগাযোগের জন্য নিয়মকানুনগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহারের সক্ষমতা এবং শব্দ উচ্চারণ, পড়া ও লেখা ইত্যাদির দক্ষতা হচ্ছে ভাষা ও যোগাযোগমূলক বিকাশ। যেমন- শিশুর সাথে গান, গল্প ও ছড়া বলা ও শোনার মাধ্যমে শিশুর ভাষা ও যোগাযোগের দক্ষতার বিকাশ ঘটে থাকে

বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ (Cognitive Development): সামাজিক ও ভৌত পরিবেশ সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান ও ধারণা এবং তাদের চিন্তা, গাণিতিক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও যুক্তি দেখানোর সক্ষমতা হচ্ছে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। যেমন- ছবি দেখে ও মিলিয়ে চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া, সংখ্যা চেনা ও ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করার মাধ্যমে মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে।

তথ্যসূত্র

১. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের আদর্শিক মান (২০২০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও ইউনিসেফ

অংশ-গ: শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালের গুরুত্ব

শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকাল: মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে যা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এগিয়ে চলে। সামগ্রিকভাবে জীবন বিকাশের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বয়স ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। তবে এই বিভাজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতও রয়েছে। সাধারণত ভ্রুণাবস্থা থেকে প্রারম্ভিক শিশুকাল শুরু হয় তবে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অন্যন্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শিশুকাল বা শৈশবকে কয়েকটি ছোট ছোট পর্বে ভাগ করা হয়; যেমন- প্রারম্ভিক শৈশব, শৈশব ও কৈশোর।

প্রারম্ভিক শৈশব: পৃথিবীর প্রায় অনেক দেশেই প্রারম্ভিক শৈশব বলতে গর্ভ থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। বাংলাদেশে 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩' অনুযায়ী প্রারম্ভিক শৈশবকাল গর্ভ থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে মূলতঃ ভ্রুণাবস্থা থেকে ৫ বছর জীবনব্যাপী শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তি গঠনের সাথে সম্পৃক্ত এবং ৬-৮ বছর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় সহজ ও সাবলীল উত্তরণের সাথে সম্পৃক্ত।

শৈশবকাল: সাধারণত প্রাক-কৈশোর থেকে যৌবনাগমন (Adolescence) এর পূর্ব পর্যায়টিকে ধরা অর্থাৎ শিশুর ১১ বছর বয়স সীমাকে বুঝানো হয়।

শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালের বিকাশের গুরুত্ব: মানবজীবনের মূল ভিত্তি গঠিত হয় প্রারম্ভিক শৈশবে। এ সময়কালে শারীরিক ও পেশি সঞ্চালন, সামাজিক ও আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ বিকাশের মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। যেমন-

- প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর মস্তিষ্কের গঠন, বিকাশ, মস্তিষ্কের কোষসমূহের সংযোগসাধনের মাধ্যমে শিশুর সুস্থতা ও সার্বিক বিকাশের অধিকাংশ ঘটে যা শিশুর বিকাশে দীর্ঘমেয়াদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতারং এই

বয়সের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন সহকারে লালন-পালন করলে শিশুর মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করার জন্য বিকশিত হবে। আর প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন না পেলে শিশুর মস্তিকের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় যা পরবর্তীকালে পুরণ করা সম্ভব হয় না।

- উদাহরণ দিয়ে এভাবে বলা যেতে পারে যে, একটি বাড়ি তৈরির সময় যদি ভিত্তি যদি মজবুত না হয় তবে বাড়িটি টেকসই হবে না অর্থাৎ বাড়ির পিলার/ভিত বা ইট সরিয়ে নেওয়া হলে বাড়িটি ভেঙে পড়বে। ঠিক তেমনভাবেই শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবের ভিত যদি শক্ত না হয় তাহলে তার বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে এবং পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না। পরিপূর্ণ বিকশিত শিশুর জন্য চাই শুরুতেই সঠিক আদর-যত্ন। প্রারম্ভিক শৈশবে সঠিক আদর-যত্ন পেলে শিশু পরবর্তী জীবনে স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত হবে ।

সুতরাং মানবজীবনের ভিত্তি গঠনের ক্ষেত্রে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবের বিকাশের গুরুত্ব অপরিসীম।

অধিবেশন-৪	শিরোনাম: শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা এবং শিশুর বিকাশ ও যত্নে করণীয়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বিকাশের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জেনে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিশুর বিকাশ ও যত্নে নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক এর পাঁচটি উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা এবং শিশুর বিকাশ ও যত্নে করণীয়	সহায়ক তথ্য-৪

অংশ-ক:

শিশুর বিকাশ: আচরণ, দক্ষতা, কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতাতে শিশুর যে পরিবর্তনসমূহ ঘটে তাকে শিশুর বিকাশ বলে। এই বিকাশ বলতে শিশুর শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা, সামাজিক ও আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ- এই চারটি ক্ষেত্রের বিকাশকে বোঝায়।

শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা: শিশুর জীবনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকাল পর্বটি তার যত্ন ও বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবে শিশুর বুদ্ধি বিকাশের পাশাপাশি মস্তিষ্কের বিকাশের বিষয়টিও তাৎপর্যপূর্ণ। এসময় প্রতিকূল পরিবেশ, খারাপ অভিজ্ঞতা, দারিদ্রতা তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থা শিশুর সার্বিক বিকাশে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সামাজিক শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কিছু জৈবিক ও মনো-সামাজিক উপাদান নিচে উল্লেখ করা হলো-

অপুষ্টিজনিত কারণ: যে সকল শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে তাদের বয়সের তুলনায় ওজন ও উচ্চতা কম হয়। তারা কোনো কিছুতে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারেনা, সকলের সাথে মিলেমিশে খেলতে, কথা বলতে আগ্রহী হয়না ফলে তাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কম হয় যা তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

আয়োডিন ও আয়রণ ঘাটতিজনিত কারণ: থাইরয়েড শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশে প্রভাব ফেলে। আয়োডিনের অভাবে জন্মগতভাবে হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে যা মানসিক প্রতিবন্ধকতার সবচেয়ে বড় কারণ। আবার, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার ব্যপকতা ৪৬-৬৬% পর্যন্ত দেখা যায় যার মূল কারণ হিসেবে আয়রণ ডেফিসিয়েন্সি এ্যানিমিয়া বলে মনে করা হয়। এর ফলে শিশুদের মানসিক, শারিরীক, সামাজিক, আবেগিক ও স্নায়ুশরীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত হয় যার প্রভাব স্বল্পমেয়াদী এবং জীবনব্যাপী হতে পারে।

জিঙ্ক এবং ভিটামিন এ ও বি১২ এর প্রভাবঃ জিঙ্কের ঘাটতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো অসুস্থতা এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির দিক থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। প্রয়োজনীয় জিঙ্ক এর অভাব শিশুদের মনোসামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারিরীক ও আচরণগত বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

সংক্রামক রোগের প্রভাবঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে সংক্রামক রোগ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে যা তাদের বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতিয়াংশ মানুষ অন্ত্রেও হেলমিন্থের (এক প্রকার সংক্রামক রোগ) অন্তত একটি প্রজাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং উচ্চমাত্রায় সংক্রমিত হয়েছে বিদ্যালয়গামী শিশুরা। এর প্রভাবে তাদের ভাষাগত দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে এবং শারিরীক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

এছাড়াও শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়া রোগের সংক্রমণ হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা। বিশ্ব জনসংখ্যার ৪০% এর ও বেশি অর্থাৎ ৯০ টি দেশের মানুষ ম্যালেরিয়ার উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে। এর মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি ছিল যার ফলে তাদের স্নায়বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

পরিবেশগত প্রভাবঃ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশগত প্রভাবের মধ্যে সীসার প্রভাব অন্যতম একটি ক্ষতিকর দিক। কসোভোতে একটি গবেষণায় দেখা গেছে সীসাযুক্ত এলাকায় বসবাসরত শিশুদের মেধাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারিরীক, দৃষ্টি, সামাজিক ও আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে যারা আর্সেনিক যুক্ত কূপ থেকে পানি পান করেছে তাদের উপস্থিত বুদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। আবার, বাংলাদেশে বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে যারা ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর সংস্পর্শে এসেছে তারাও একইভাবে কম উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন।

মনোসামাজিক ঝুঁকির কারণসমূহঃ গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা মূলতঃ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে- শিশুকে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা প্রদান, শিশুর প্রতি সংবেদনশীলতা এবং দায়িত্ব। তাই এই বিষয়গুলোর ঘাটতি শিশুর বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই বিষয়গুলোর প্রভাব একটি দেশের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং এগুলোর চর্চার ওপর নির্ভর করে।

মা-বাবার ভূমিকাঃ শিশুর বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিশুকে উদ্দীপনা প্রদান এবং শেখার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যা শিশু পারিবারিক পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকে। এর মাধ্যমে শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, যেকোনো কিছু শিখতে আগ্রহী হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক আচরণ, মিলেমিলে খেলার দক্ষতা, ইতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। পারিবারিক পরিবেশে এসকল বিষয়গুলো অনুপস্থিতি শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

মাতৃত্বকালীন বিষন্নতাঃ গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিকভাবে বিষন্ন মায়েরা শিশুর সাথে কম সময় দেয়, তাদের আদর-যত্ন কম করে এবং নেতিবাচক আচরণ বেশি করে যা শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

এছাড়াও শিশুর প্রতি অতিরিক্ত শাসন ও নিয়মনিষ্ঠা, অতিমাত্রায় প্রশংসা করা ও ভালোবাসা, অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

অংশ-খঃ শিশুর বিকাশ ও যত্নে নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্কের উপাদানসমূহ

গর্ভকাল থেকে জন্মের পর প্রথম পাঁচ বছর শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এসময়ে শিশু নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। ২০১৮ সালে ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহারের জন্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের পরিচর্যা ও যত্ন কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এই কাঠামোটিতে শিশুর পরিচর্যা ও যত্নের কাজটি ভালোভাবে করার জন্য পরিচর্যা ও যত্নসমূহকে পাঁচটি উপাদানে বিন্যাস করা হয়েছে। যেহেতু প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশব কালে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ, স্বাস্থ্য, শিখন তথা সামগ্রিক বিকাশের ভিত্তি তৈরি হয় এবং পরবর্তী বয়সে তা স্থায়ী হয়, তাই এই কাঠামোর উল্লিখিত পাঁচটি উপাদান আন্তঃসম্পর্কিত এবং একটি আরেকটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যা শিশুর জীবনের প্রারম্ভিক বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রভাব ফেলে এবং শিশুর সর্বোত্তম বিকাশে ভূমিকা ও রাখে।

নার্চারিং কেয়ার কাঠামোর উল্লিখিত পাঁচটি উপাদানে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সেবার কথা নিচে বর্ণনা করা হলো।

Component of Nurturing Care

১. **সুস্বাস্থ্যঃ** শিশুর টিকাদান, নবজাতক, রোগাক্রান্ত শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা ও সমন্বিত শিশুর চিকিৎসা, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ সেবা এবং শিশু ও যত্নকারীর মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য সহায়তার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত আছে।

২. **পর্যাপ্ত পুষ্টিঃ** গর্ভকালীন সময় থেকে প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকাল পর্যন্ত শিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টি, শিশুর ওজন ও উচ্চতা মনিটরিং ও রেফার করা, অপুষ্ট শিশুর চিকিৎসার সেবাসমূহ এ উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। মাঝারি ও মারাত্মক ধরনের অপুষ্টি এবং মাত্রাধিক ওজন/স্থূতা থাকলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শিশুকে কৃমির বড়ি ও সম্পূরক ভিটামিন-এ খাওয়ানো, অসুস্থ/রোগাক্রান্ত শিশুকে যথোপুযুক্ত খাবার খাওয়াতে সহায়তা করা এর অন্তর্গত।

৩. **সংবেদনশীল যত্নঃ** মা-বাবা/যত্নকারী/শিক্ষকের এমন কাজ করা যা শিশুকে তার সাথে খেলতে ও ভাবের আদান-প্রদান/কথা বলতে উৎসাহিত করে। শিশুর ইঙ্গিত/ইশারা (child's cues) অনুযায়ী স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীলতার সাথে বড়দের কাজ করা। বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিশুর সেবা-যত্নে সম্পৃক্ত করা। সর্বেপরি শিশুর সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের সহযোগিতা প্রদান।

৪. **প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগঃ** শিশুর সাথে বয়স অনুযায়ী খেলা করা, গান/ছড়া/বই পড়ে শুনানো ও গল্প বলা এবং এবং এগুলো কীভাবে করতে হবে সে ব্যাপারে শিক্ষককে/যত্নকারিকে সহযোগিতা দেওয়া। মা-বাবাকে প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগগুলো সম্পর্কে তথ্য, উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং গৃহকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু ও ঘরে বানানো খেলনার মাধ্যমে শিশুকে শেখার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা। প্রাতিষ্ঠানিক প্রারম্ভিক শিখন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, বই ভাগাভাগি, খেলনা ও বইয়ের লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

৫. **সুরক্ষা ও নিরাপত্তাঃ** শিশুর জন্ম নিবন্ধন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, বাড়িতে-বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধির চর্চা, বায়ু দূষণ কমানো ও প্রতিরোধ করা, নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, বাইরে খেলার স্থানের ব্যবস্থা করা, নিকটজন/ঘনিষ্ঠজন কর্তৃক ও পরিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়গুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অধিবেশন-৫	শিরোনাম: শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্ব ও করণীয়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালে মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে করণীয় কী চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্ব ও করণীয়	সহায়ক তথ্য-৫

অংশ-ক: শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ

প্রারম্ভিক বছরের সার্বিক বিকাশের ওপর মস্তিষ্কের গঠন নির্ভর করে। সাধারণভাবে মস্তিষ্ককে দুভাগে ভাগ করা হয়- ডান মস্তিষ্ক এবং বাম মস্তিষ্ক। বাম মস্তিষ্ক যেমন যুক্তি-তর্ক, ঘটনার বর্ণনা, গণিত, ভাষা দক্ষতা, চিন্তা, ডানদিকের দৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। আবার ডান মস্তিষ্ক সংগীত, কাজের ধারাবাহিকতা, সৃজনশীলতা, কল্পনা শক্তি, শ্রবণ, বামদিকের দৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্কের বিকাশ: শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত মস্তিষ্কের বিকাশ সবচেয়ে বেশি হয়। মস্তিষ্কের নিউরণের সংযোগ সৃষ্টিতে এবং বৃদ্ধির জন্য শিশুকে উদ্দীপনা (আদর করা, কথা বলা, হাসা, ছড়া, খেলা করা) প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন উদ্দীপনা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সংযোজিত হতে সহায়তা করে। একটি শিশুর মস্তিষ্ক পূর্ণতা পায় দুইদিক থেকে যেমন-

আকৃতিগত বৃদ্ধির মাধ্যমে: আকৃতিগত বৃদ্ধির মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষের (neuron) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। **সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে:** একটি নিউরনের সাথে আরেকটি ও একাধিক নিউরণের সংযোগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্তজাল তৈরি হয় (neural connection & network formation)। মস্তিষ্কের একটি কোষ সর্বোচ্চ ১৫,০০০ কোষের সাথে সংযোগ করতে পারে। শিশুর ৩ বছর বয়সের মধ্যে ৭০-৮০% এবং ৫ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় ১০০% সংযোগ স্থাপিত হয়। তাই এই বয়সে যত বেশি পারস্পারিক ক্রিয়া (Interaction) ঘটে তত বেশি সংযোগ তৈরি হয়। এভাবে শিশুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক পূর্ণতা লাভ করে। তাই নিউরণের সংযোগ ঘটাবার সর্বোৎকৃস্ট সুযোগ (windows of opportunities) হলো জন্ম থেকে ৫ বছর বয়সকাল।আবার, এই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে তা হারিয়ে যায় অর্থাৎ এটি 'ব্যবহার না করলে হারিয়ে ফেলবে' (use it or lose it) প্রক্রিয়ায় কাজ করে। ৫-৬ বছর বয়সের পর নতুন সংযোগ তৈরি না হলেও সংযোগের স্থায়ীত্বের জন্য শিশুর ৮ বছর বয়স পর্যন্ত পারস্পারিক ক্রিয়ামুলক যত্ন (interactive care) চালিয়ে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মস্তিষ্কের বিকাশের কিছু মৌলিক তথ্য

- মস্তিষ্কের নিউরণের সংখ্যা বৃদ্ধির অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো মায়ের গর্ভে থাকাকলীন অবস্থায় এবং সংযোগ বৃদ্ধি ও অন্তজাল তৈরির সময় হলো জন্মের পর।
- নিউরণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও অন্তজাল তৈরি ছাড়া মস্তিষ্ক কাজ করতে পারে না।
- সংযোগ স্থাপন ও অন্তজাল তৈরির পূর্বশর্ত হল নিউরণগুলোর উদ্দীপ্তকরণ (stimulation)।
- শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া (interaction) করা ও করার সুযোগ করে দেওয়া নিউরণগুলোকে উদ্দীপ্ত করার একমাত্র উপায়।
- মস্তিষ্কের এক এক অংশ এক এক ধরনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাই মস্তিষ্কের সব অংশের নিউরণগুলোকেই উদ্দীপ্ত (stimulate) করা প্রয়োজন।
- শিশু তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই ব্যবহার করার সুযোগ পায় এমনভাবে মিথস্ক্রিয়া করলে মস্তিষ্কের সব অংশের নিউরণ উদ্দীপ্ত (stimulated) হয়ে সার্বিকভাবে নিউরণের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে ও অন্তজাল তৈরি হবে।

তথ্যসূত্রঃ Experiences Build Brain Architecture, Center on the Developing Child by Harvard University

নমুনা চিত্রঃ মস্তিষ্কের গঠন ও এর বিভিন্ন অংশের সুনির্দিষ্ট কাজ

১। মস্তিষ্কের গঠনের ছবি মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করুন।

২। মস্তিষ্কের বাম ও ডান অংস:

মস্তিষ্ক এর দুই অংশ সমান, আকৃতিগতভাবে দুই অংশ একই রকম, কার্যকারিতা অনুযায়ী দুই অংশ ভিন্ন, দুই অংশই সংযুক্ত।

মস্তিষ্ক এর বাম অংশ: যৌক্তিক চিন্তা ও ভাষা পরিচালনা, গণিতে দক্ষতা, ডান দিকের দৃষ্টিক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ কাজ করে।

মস্তিষ্ক এর ডান অংশ: স্থান, অবস্থান ও শ্রবণ ধারণা পরিচালনা, সঙ্গীত ও সৃজনশীলতা, বাম দিকের দৃষ্টিক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। মস্তিষ্ক এর বিকাশ: দুই ভাবে হয়হ- আকৃতিগত বৃদ্ধি, সংযোগ বৃদ্ধি

আকৃতিগত বৃদ্ধি: মস্তিষ্ক এর কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি।

সংযোগ বৃদ্ধি: একটির সাথে কয়েকটি ও একাধিক নিউরণের সংযোগ বৃদ্ধি এবং অন্তজাল তৈরি ।

একটি কোষ সর্বোর্চ ১৫০০০ কোষের সাথে সংযোগ করতে পারে।

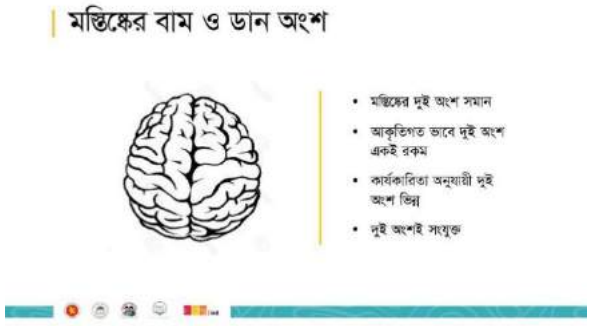

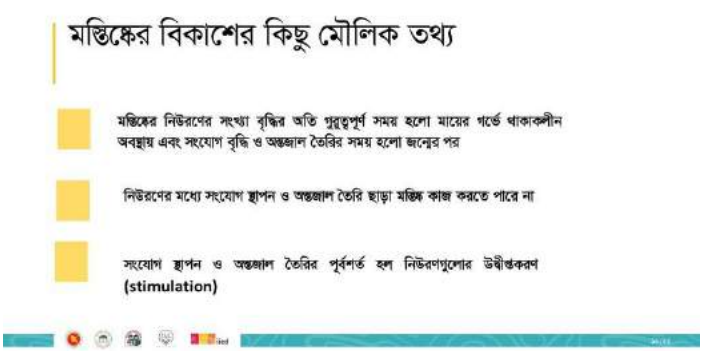

অংশ-খঃ শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ বিকাশে মা-বাবা, শিক্ষক ও বড়দের করণীয়

শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মায়ের খাদ্য, পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সর্বোপরি মায়ের ভালো থাকা শিশুর মস্তিষ্কের কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তার জন্য জন্মের পূর্ব থেকেই মায়ের যত্ন নিতে হবে। জন্মের পর থেকেই শিশু শেখার জন্য প্রস্তুত থাকে। পরিবারে মা-বাবা ও অন্যান্য

সদস্য ও শিক্ষকের সঠিক পরিচর্যা, যত্ন ও উদ্দীপনামূলক কাজের মাধ্যমে শিশুর মস্তিষ্কের কোষের সংযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্কে প্রদত্ত ৫টি উপাদানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তা করা যেতে পারে। শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তার জন্য মা-বাবা, শিক্ষক ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। যেমন-

- শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা
- শিশুকে উদ্দীপনা প্রদান করা যেমন-
  - শিশুর সাথে কথা বলা, চোখে চোখ রাখা, হাসা
  - শিশুকে জড়িয়ে ধরা, আদর ও ভালোবাসা দেওয়া
- শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী সাড়া দেওয়া অর্থাৎ শিশুর অঙ্গভঙ্গি, ইশারা, মুভখঙ্গি ইত্যাদি দেখে তাকে সাহায্য করা (সংবেদনশীল যত্ন নেওয়া)
- প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। যেমন- শিশুর সাথে ছড়া, খেলা করা, খেলার মাধ্যমে প্রাক-গাণিতিক, পরিবেশ-বিজ্ঞানের ধারণা দেওয়া, গান করা ও গল্প শোনানো ইত্যাদি
- ইতিবাচক ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি করা
- বিদ্যালয়ের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা
- পর্যাপ্ত পরিমান বয়সোপযোগী খেলনা ও উপকরণ রাখা
- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা রাখা
- সৃজনশীলতার বিকাশে বিভিন্ন কাজে শিশুকে উৎসাহিত করা
- শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক যত্ন ও উদ্দীপনা (interactive care & stimulation) দেওয়ার মূলনীতি হলো-
  - প্রতিদিন বারবার করা (Everyday Repeatedly)
  - বয়স অনুযায়ী করা (Age Appropriate)
  - নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশে করা (Safe & Enabling Environment)
  - বিভিন্নভাবে (Multiple Ways) যাতে শিশু তার পঞ্চইন্দ্রিয় ও হাত-পা ব্যবহার করার সুযোগ পায়
  - ছেলে-মেয়ে শিশুর সাথে সমানভাবে করা।

এই মূলনীতিসমূহ বুঝার সুবিধার্থে নিচে কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন-

- **বয়স অনুযায়ী:** খাবার পানি রাখার জন্য যদি মাটির কলসি ব্যবহার করতে হলে প্রথমে মাটির কলসি তৈরি করতে হবে। মাটির কলসি তৈরির প্রক্রিয়া হলো: প্রথমে মাটি পানি দিয়ে মিশিয়ে মন্ড তৈরি করে তারপর কলসির আকৃতি বানিয়ে কয়েকদিন রোদে শুকানো, তারপর আগুনে পুড়িয়ে আবার কয়েকদিন রোদে শুকালে পানি রাখা যাবে। এই প্রক্রিয়ায় কেউ যদি রোদে শুকানোর পরই পানি রাখে তাহলে কলসিটি কিছুক্ষণ পর গলে যাবে। তেমনি শিশুর বয়স অনুযায়ী ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনোকিছু চাপিয়ে দিলে তা শিশুর জন্য ক্ষতিকর হবে।
- **নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ:** শিশুকে খেলনা কিনে দিয়ে খেলনাটি বাক্সে রেখে দিলে বা শিশুকে অন্ধকার ঘরে রেখে দিলে শিশুটি কিন্তু খেলনাটি ব্যবহার করতে পারবে না বা খেলতেও পারবে না। অথবা খেলনা দিয়ে

শিশুকে ধমক দিয়ে খেলতে বললে শিশুটি আনন্দ নিয়ে খেলবে না। মাননিক দিক থেকে সে ভালো থাকবে না এবং খেলনা ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে না।

- **পঞ্চইন্দ্রিয় ও হাত-পা ব্যবহার করার সুযোগঃ** মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- দেখা পিছনের দিকের নিচের অংশ, শোনা-বলা নিচের অংশের মধ্যভাগ, স্পর্শ (অনুভব) করা পিছনের দিকের উপড়ের অংশ, চলন ক্ষমতা উপড়ের দিকের (তালুর) মধ্যভাগ, চিন্তা/যুক্তি/সমস্যার সমাধান/সিদ্ধান্ত গ্রহণ তালুর সামনের দিক ও কপালের পিছনে উপড়ের অংশ, পরিকল্পনা ও অনুশীলন করা সামনের দিকের নিচের (কপালের পিছনের) অংশ। তাই শিশুকে শুধু দেখতে বা শুনতে দিলে তার মস্তিষ্কের যে অংশটুকু দেখা ও শোনা নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত সেই অংশের কোষগুলো সক্রিয় হবে ও সেগুলোর মধ্যে সংযোগ তৈরি হবে। অন্য অংশের কোষগুলো সরাসরি সক্রিয় হবে না এবং সেগুলোর মধ্যে পুরাপুরি সংযোগ তৈরি হবে না। তাই শিশুকে এমনভাবে উদ্দীপনা ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক যত্ন দিতে হবে যাতে মস্তিষ্কের সব অংশের কোষগুলোই উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় হয়ে সংযোগ তৈরি করতে পারে। আর এজন্য শিশুকে এমনভাবে পারস্পারিক ক্রিয়ামুলক যত্ন দেওয়া যাতে সে তার পাঁচটি ইন্দ্রিয় যথা: চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের যথাযথ ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

অধিবেশন-৬	শিরোনাম: শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর বিকাশে পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ. শিশুর বিকাশে পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা নিরসনের কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা — সহায়ক তথ্য-৬

অংশ-ক

শিশুর বিকাশে তার পরিবারের পাশাপাশি তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু কোন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, তার সাথে তার শিক্ষকদের সম্পর্ক কেমন, তার খেলার সাথীদের সাথে সে কী খেলে, কীভাবে মেশে, তার বাবা-মায়ের সাথে তার শিক্ষকদের কেমন সম্পর্ক এরকম বিভিন্ন বিষয় শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এমন কি বড় হবার পর তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে কীরকম আচরণ করবে, কী সিদ্ধান্ত নিবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে পরিবার এবং পরিবেশের এই সমস্ত উপাদান শিশুর উপর কীভাবে এবং কতখানি প্রভাব ফেলে তার উপর। শিশুর আচরণ এবং তার প্রয়োজনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাই তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাশিয়ান-আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ইউরি ব্রনফেনব্রেনার (Urie Bronfenbrenner) পরিবেশের এই সামগ্রিক প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যা বাস্তুসংস্থান তত্ত্ব (Ecological System Theory) নামে পরিচিত। ব্রনফেনব্রেনারের এই তত্ত্বমতে শিশুর উপর তার এই পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব প্রধানত চারটি স্তরে কাজ করে। পরবর্তী অংশে এই চারটি স্তর আলোচনা করা হলো।

মাইক্রো সিস্টেম: এই স্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে শিশু। শিশু তার দৈনন্দিন জীবনে যাদের কিংবা যে সকল প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সংস্পর্শে আসে সেই সমস্ড় মানুষ বা প্রতিষ্ঠান তার এই মাইক্রো সিস্টেমের উপাদান। মা-বাবা, ভাই-বোন, খেলার সাথী, বিদ্যালয়, শিক্ষক, ডেকেয়ার সেন্টার ইত্যাদি এই স্ড়রের অন্ড়র্ভূক্ত। শিশুর আচরণ এবং জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্ড়ার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে- শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষে শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করেন, তবে পড়াশোনার প্রতি শিশুর একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে। তেমনি বাবা-মায়ের সাথে শিশুর সুসম্পর্ক তাকে পরবর্তীতে দায়িত্বশীল একজন মানুষে পরিণত করবে।

মেসো সিস্টেম: এই স্তরে মাইক্রো সিস্টেমের উপাদানগুলো পরস্পরের সাথে যেভাবে মিথস্ক্রিয়া করে এবং তার ফলশ্রুতিতে শিশুর উপর যে প্রভাব পড়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে- যখন কোন শিশুর বাবা-মা নিয়মিত তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন, সেই শিশুর পড়ালেখায় তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। একইভাবে, মাইক্রো সিস্টেমের উপাদানগুলির মধ্যে যদি ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া না হয়, তবে তা শিশুর জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এক্সো সিস্টেম: এই স্তরে রয়েছে সেই সমস্ড় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাদের প্রভাব শিশুর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে না পড়লেও পরোক্ষভাবে পড়ে থাকে। যেমন- দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বাবা-মায়ের কর্মক্ষেত্র, দেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। যেমন- এটা খুবই স্বাভাবিক যে উন্নত দেশের শিশুদের তুলনায় অনুন্নত দেশের শিশুরা পড়ালেখার ক্ষেত্রে কম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে যা তার পরবর্তী জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে।

ম্যাক্রো সিস্টেম: যে রাষ্ট্রে বা সমাজে শিশু বাস করে তার সামগ্রিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আইন ইত্যাদি বাস্তুসংস্থান তত্ত্বেও সর্বশেষ স্ড়র। এই সমস্ত উপদানের দ্বারাও শিশুর জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত হতে পারে। যেমন- যে দেশে বাল্যবিবাহ বহুল পরিমাণে প্রচলিত, সে দেশের মেয়ে শিশুর পড়ালেখার পথে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকে।

ক্রোনো সিস্টেম: এই স্তরটি পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে। মানব শিশুর উন্নয়নের ধারাকে বিশে-ষণ করলে দেখা যাবে যে উপরের চারটি স্ড়রের উপাদান ছাড়াও তার জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা বা সময়ের খুব বড় প্রভাব থাকতে পারে। যেমন- কোন প্রিয়জনের মৃত্যু; অথবা প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ শিশুর বেড়ে ওঠা বা তার পড়াশুনার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

র্দেশিকা

শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা

অধিবেশন-৭	শিরোনাম: শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী শিখন আচরণে করণীয়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার ধারণা ব্যাখ্যা কাতে পারবেন;

খ. শিশুর বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার ধরণ অনুযায়ী শিখন আচরণ চিহ্নিত করতে পারবেন এবং শিখন আচরণ অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার ধরণ অনুযায়ী শিখন আচরণে করণীয়	সহায়ক তথ্য-৭

অংশ-ক: শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরণ

গার্ডনারের মাল্টিপল ইন্টিলিজেন্স (Multiple Intelligences) থিওরি বা বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তা-

হাওয়ার্ড আর্ল গার্ডনার ১১ জুলাই, ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি পেশায় একজন আমেরিকান ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলোজিস্ট।১৯৮৩ সালে হাওয়ার্ড আর্ল গার্ডনার তার বই " ফ্রেমস অফ মাইন্ড" এ প্রথম "একাধিক বুদ্ধিমাত্রার তত্ত্ব (Theory of Multiple Intelligences)" উপস্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে ৭টি বুদ্ধিমত্তা অন্যতম। যেমন-

১. **ভাষাবৃত্তিক বুদ্ধিমত্তা (Linguistic Intelligence):** যে শিশুর ভাষাগত বুদ্ধি প্রখর, সে সুন্দর করে কথা বলতে পারে, ছড়া,গান করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয় ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

২. **যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা (Logical-Mathematical Intelligence):** যে শিশুর যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রখর, সে তার বয়স উপযোগী গণিতিক জটিলতাগুলো সহজে বুঝতে পারে এবং সমাধান করতে পারে।

৩.**দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা (Spatial-Visual Intelligence):** কোনো শিশুর মধ্যে দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা থাকলে সে সহজে বিভিন্ন অবস্থান বিষয়ক নিদর্শনা বুঝতে পারে যেমন - বইটি টেবিলের উপর রেখে আসো, একটি পুতুল কোনো বইয়ের পাশে রেখে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে পুতুলটি কীসের পাশে ইত্যাদি। আরও দেখা গেছে এই শিশুরা ছবি, আকার-আকৃতি ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

৪.**শরীরবৃত্তিক বুদ্ধিমত্তা (Bodily-Kinesthetic Intelligence):** যে শিশুর শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা প্রখর সে ভালো নাচতে পারে, হাত-পা নাড়িয়ে ব্যায়াম করতে পারে, দৌড়াতে পারে এবং বিভিন্ন শারীরিক খেলাধূলায় পারদর্শী হয়।

৫.**ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা (Musical Intelligence):** শিশুর মধ্যে ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধি প্রখর হলে সে সুর ও ছন্দঠিক রেখে ভালো গান গাইতে পারে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে।

৬.**অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Intrapersonal Intelligence):** যে শিশুর মধ্যে অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা থাকে, সে নিজের শক্তি ও দুর্বলতাগুলো ভালভাবে বুঝতে পারে। যেমন শিশুরা যে কাজ ভালো পারে তা সে বারবার করতে চায়, সবাইকে দেখাতে চায়।

৭.**আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Interpersonal Intelligence):** যে শিশুর মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা থাকে সে অন্যদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। সমবয়সী, ছোট বা বড়দের সাথে মিশতে পারে এবং মিলেমিশে খেলা করতে পারে।

উপরে উল্লিখিত intelligence ছাড়াও হাওয়ার্ড আর্ল গার্ডনার আরও তিনটি intelligence এর কথা বলেছেন, যেমন- naturalistic, existential and digital intelligences. উপরের সাতটি intelligence সহজে পরিমাপ করা যায়, আমরা সহজে এগুলো বুঝতে পারি তাই এগুলো নিয়েই আলোচনা করা হলো।

শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী শিখন আচরণ

শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের শিখন আচরণ চিহ্নিত করতে পারেন। কারণ শিক্ষক সবচেয়ে বেশি সময় শিশুদেরকে শিখন পরিবেশে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান এবং তাদের সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা রাখেন। এখানে শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী শিখন আচরণের ধারণা দেওয়া হলো-

- কিছু শিশু আছে তারা শুনে শুনে ভালো শিখতে পারে। শিক্ষক যা বলেন এবং যেভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যা পাঠ সম্পর্কে যা বলে শিশু সেখান থেকে ভালো করে শিখে। একই পড়া শিক্ষার্থী বার বার শুনতে চায়।

- যেসব শিশুর যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রখর তাদের বয়স উপযোগী গাণিতিক সমস্যা নিজে নিজে সমাধান করতে পছন্দ করে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের এই শিখন ধরন শিক্ষক সনাক্ত করতে পারেন।

- কোনো কোনো শিশু দেখে শিখতে বেশি আগ্রহী হয় বা দেখে শিখলে বেশি মনোযোগ দেয়। তাদের আসলে দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা অন্যদের তুলনায় একটু বেশি থাকে।

- যেসব শিশুর শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা ভালো তারা কোনো কিছু করার মাধ্যমে ভালো শিখে। যেমন- নেচে, হাত পা ব্যবহার করে বা শারিরীক চলাচলের মাধ্যমে।

- আবার কিছু ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধি প্রখর থাকে। ছন্দময় কিছু থাকলে তারা দ্রুত শিখে নিতে পারে।
- যে শিশুর মধ্যে অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা থাকে তারা একা একা কাজ করতে পছন্দ করে এবং এভাবে ভালো শিখে।
- কিছু শিশু থাকে যারা সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পছন্দ কওে আবার সবার সঙ্গে একসঙ্গে শিখতেও পছন্দ করে। তাদের যোগাযোগ দক্ষতা হয় খুব ভালো। এসব শিশুর মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রবল।

শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী শিখন আচরণ অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের শিখন আচরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী তাদের শিখনের জন্য যেমন একটি পাঠপরিকল্পনা করতে পারেন যেখানে সব ধরনের বুদ্ধিমত্তার শিশু শেখার সুযোগ পায়।

- যেসব শিশু শুনে শুনে ভাল শিখতে পারে তাদের জন্য শিক্ষক পাঠ ভালো করে ব্যাখ্যা করলে এবং সেইসব শিক্ষার্থীদের বেশি বলার সুযোগ দিলে তাদের শিখন ভালো হবে।
- যেসব শিশুর যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রখর সেসব শিশুদের জন্য শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে কিছু গাণিতিক সমস্যা দিতে পারেন এবং কিছু নতুন গাণিতিক সমস্যা তৈরি করে দিতে পারেন। অনেক সময় তাদেরকে অনুশীলনীর সমস্যা সমাধান করতে দিতে পারেন।
- শিক্ষক যখন পাঠ পরিকল্পনা করেন, তখন যেসন শিশু কিছু দেখে ভালো শিখে তাদের কথা মাথায় রেখে পাঠে কিছু ভিজ্যুয়াল উপকরণ রাখতে পারেন। যখন শ্রেণিতে দলীয় কাজ দিবেন, তখন তাদেও জন্য ভিজ্যুয়াল উপকরণ রাখবেন এবং তাদেরকে ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহার এবং তৈরি করতে উতসাহিত করবেন। শ্রেণিকক্ষের বাইওে নিয়ে কিছু দেখিয়ে শেখানো তাদের জন্য ভালো হয়।
- যেসব শিশুর শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা ভালো শিক্ষক তাদের পাঠ পরিকল্পনায় এমন কিছু রাখবেন যেখানে শিশুদের হাত পা বা কিছুটা চলচলের মাধ্যমে পাঠে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। যেমন্ কিছু অভিনয় কওে দেখানো বা পাঠ সংস্লিষ্ট কিছু তৈরি করা।
- ছোট শ্রেণিতে শিক্ষক ছড়া, গান ইত্যাদি ব্যবহার করে শিশুদের সহজে শেখাতে পারেন। তুলনামূলক বড় শ্রেণিতে কিছু কিছু পাঠে বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক এভাবে শেখার সুযোগ রাখতে পারেন। এতে কওে যেসব শিশুর ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধি থাকে তারা দ্যুত শিখে।
- শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এসব শিশুদের অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বুঝতে পারেন এবং তাদেও জন্য জন্য একা একা পড়াব কাজের সুযোগ দিতে পারেন। যেমন- কোন কিছু ব্যাখ্যা করা বা নিজে কিছু কওে অন্যদের দেখানো।
- শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা চিহ্নিত করতে পারেন এবং এসব শিশুদের জন্য বেশি বেশি দলীয় কাজের বা দলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এতে করে তাদের শিখন দীর্ঘস্থায়ী

হবার সম্ভাবনা থাকে। এসব শিশুরা যদি সুযোগ পায় তবে তাদের সহপাঠীদের কোন কিছু বুঝিয়ে দিতে আনন্দ পায়।

অংশ-খঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার উপাদান

পারিবারিক সংস্কৃতি

নিচের বিষয়গুলোর কারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা দেখা যায়? যেমন-

- আমার পরিবার কোন জিনিসটি মূল্য দিয়ে থাকে এবং কীভাবে তারা আচরণ করে?
- আমার পারিবারিক রুটিন ও প্রিয় কাজগুলো কী কী?
- পরিবারের সবাই অবসর কীভাবে কাটায়?
- ঘুম ও খাওয়ার সাধারণ রুটিন, আমরা যে খাবারগুলো খাই?
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে আমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করি?
- যে গানগুলো আমরা শুনে থাকি ইত্যাদি।

সামাজিক শ্রেণি

আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরা নিজেদেরকে কোন শ্রেণির বলে মনে করি? কেন?

উদাহরণস্বরূপ- মধ্যবিত্ত লোকেরা সময়কে কঠোরভাবে গুরুত্ব দেয় এবং কিছু মনে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অপরদিকে দরিদ্র এবং ধনী লোকেরা এক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় হয়ে থাকেন।

বয়স/বিকাশের ধরন

বিকাশের ভিন্নতার কারণে অনেক সময় শিশু তার বয়সের চেয়ে বেশি পরিণত বা সক্ষম হয়, আবার অনেক সময় বয়সের তুলনায় কম পরিণত হয়। ব্যক্তির বয়স তার বিশ্বাস এবং কার্যকলাপ প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ পাঁচ বছর বয়সি শিশুরা বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে, আরও স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করতে পারে, আরও বেশি কিছুতে নিযুক্ত হতে পারে। অন্যদিকে তিন বছরের শিশুরা ততটা পারে না। তবে জন্মের পরে পুষ্টি ও এক একটি কাজের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন উদ্দীপনা মস্তিষ্কের কোষগুলিকে সংযোজিত হতে সহায়তা করে। শিশুকে যে কাজের জন্য যতবেশি উদ্দীপনা দেওয়া হবে সে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোষের সংযোগ ততবেশি হবে এবং শিশু সে কাজে ততবেশি পারদর্শী হবে।

ব্যক্তিত্ব এবং মেজাজ (Temperment)

ব্যক্তিত্বের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মাধ্যমে মেজাজও বোঝা যায়। শিশুরাও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো-

চঞ্চল ↔ শান্ত

উদ্যমী ↔ ধীর গতির

কৌতুহলী ↔ উদাসীন

গ্রহণকারী ↔ সতর্ক

উদ্বিগ্ন ↔ শান্ত

শেখার ধরন বা শিখন পদ্ধতি

আমি কী দেখে শিখতে পছন্দ করি নাকি শুনে বা হাতে-কলমে কাজ করে? আবার আমি কি খেলার মাধ্যমে মজা করে শিখতে পছন্দ করি নাকি দেখে শুনে দুটোকে মিলিয়ে শিখতে পছন্দ করি? শেখার ভিন্ন ধরনের কারণেও শিশুদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

আগ্রহ

আমার শখ কী কী?

আমি যদি এই মুহূর্তে নতুন কিছু শিখতে পারি তবে তা কী হবে?

শিশুর আগ্রহ ও চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হলে তা শিখন ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হয়। তাই একজন শিক্ষক শিশুদের আগ্রহের উপরভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা তৈরি করতে পারেন যেমন- ভাষা, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

অধিবেশন-৮	শিরোনাম: শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ এবং শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া ও শিক্ষকের করণীয়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর ভাষা বিকাশের প্রক্রিয়া এবং প্রতিবন্ধকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর যোগাযোগ দক্ষতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিশুর শারিরীক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া এবং প্রতিবন্ধকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ এবং শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া ও শিক্ষকের করণীয়	সহায়ক তথ্য-৮

অংশ-ক: শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ

যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাষা। ভাষা শেখার দক্ষতা নিয়েই শিশুরা জন্মায়। বয়সের সাথে সাথে শিশুর ভাষা বিকশিত হয়। শিশুর ভাষা বিকাশকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- ১) প্রাক-কথন; এবং ২) কথা বলার স্তর। প্রাক কথন স্তরে জন্মক্রন্দন থেকে কাকলি (ব্যাবলিং স্টেজ), ভঙ্গিমা ভাষণ থাকে। কথা বলার স্তরে থাকে অনুকরণ, অর্থবোধ, শব্দ সম্ভার ও বাক্য গঠণ, ভাষণ প্রকৃতি, নিরব কথন, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা, উচ্চারণ ত্রুটি, তোতলামি।

প্রাক কথন স্তর: জন্ম মুহুর্তের পর থেকে কথা বলে যোগাযোগ স্থাপনের আগ পর্যন্ত সময় হচ্ছে প্রাক কথন স্তর।

১) **জন্মক্রন্দন:** সুস্থ শিশু জন্মের পরেই জন্মক্রন্দনের মাধ্যমে পৃথিবীর সাথে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রথম তিন মাস শিশু তার বিচিত্র স্বরধনির সাহায্যে তার অনুভূতি প্রকাশ করে। শিশু শুধু তার স্বরবৈচিত্রের সাহায্যে তার প্রক্ষোভ প্রকাশ করে তাই নয়, অন্যদের স্বর লক্ষ্য করে তাদের স্বরে বিভিন্ন প্রক্ষোভের সংকেতও সে বুঝতে পারে। তাই কয়েক মাসের শিশুকে উপযুক্ত স্বরকল্পের উত্তেজিত, শান্ত, প্রশমিত করা যায়।

২) **কাকলি:** চার মাস থেকে নয় মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা যে অর্থহীন শব্দ করতে শেখে তার নাম শৈশব কাকলি। ভাষার মধ্যে যেসব শব্দ থাকে তার প্রায় সবই শিশুরা এ সময়ে উচ্চারণ করতে পারে। এই সময়ে তারা একই শব্দ বার বার উচ্চারণ কওে, যেমন- মা মা। আমাদেও কাছে এর অর্থ থাকলেও শিশুর কাছে শব্দটি পুনরাবৃত্তি মাত্র।

৩) **ভঙ্গিমা ভাষণঃ** শিশুরা বিভিন্ন দেহ ভঙ্গিমার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। এটিও তাদের যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সামান্য প্রচেষ্টা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পিতা-মাতা শিশুর বিভিন্ন দেহ ভঙ্গিমার অর্থ সহজেই বুঝতে পারেন।

কথা বলার স্তরঃ প্রাক কথন স্তরে কথা বলার প্রস্তুতি শেষে এই স্তরে পরিবারের সবাইকে অনুকরণের মাধ্যমে কথা বলা শুরু করে। এই স্তরে যেসব প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিশুরা যায় তা হলো-

অনুকরণঃ সুস্থ শিশুরা ছয়-সাত মাস বয়স হতেই পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। দশ-এগারো মাস বয়স থেকেই মামা, দাদা, বাবা কথাগুলো বলতে শেখে এবং পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় ধীরে ধীরে মাতৃভাষা এবং বিদেশি ভাষার শব্দও আয়ত্ত করতে শেখে।

১) **অর্থবোধঃ** এই স্তরে শিশু বেশিরভাগ সময় একটিমাত্র শব্দের মাধ্যমে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু কোন পরিবেশে শিশু শব্দটি বলছে, তার দেহভঙ্গিমা, পরিস্থিতি এসবের উপর নির্ভর করে শব্দের অর্থ। যেমন- শিশুর কোন বস্তু সম্পর্কে পূর্ন ধারণা তৈরি হলেও সেই বস্তুর নাম বলে শিশু একেক সময় একেক অর্থ বা অনুভূতি প্রকাশ করে।

২) **পদ বা শব্দ সম্ভার ও বাক্যগঠনঃ** শিশুর প্রাথমিক কথোপকথনে বিশেষ্য পদের প্রাধান্য থাকে, ক্রিয়া পদের ব্যবহার কম থাকে। বিশেষ্য পদ ব্যবহার করে তারা ক্রিয়া পদের কাজ সারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া পদের ব্যবহার বাড়তে থাকে। এ বয়সে বিস্ময়সূচক শব্দের ব্যবহার করতে শিশুরা বিশেষ পছন্দ করে। বিশেষণ, সর্বনাম পদগুলো ব্যবাহার ধীরে ধীরে বাক্যে আসতে থাকে। একপদ বাক্য ব্যবহার করার কিছুকাল পর শিশুর দ্বিপদ বাক্য ব্যবহার শুর“ হয়। একটি বিশেষ্য পদ ও একটি ক্রিয়া পদ দিয়ে একটি দ্বিপদ বাক্য গঠিত হয়। বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে।

৩) **ভাষণ প্রকৃতিঃ** শৈশবে শিশুর কথা বলা প্রথমে থাকে আত্মকেন্দ্রিক, ক্রমশ তা সামাজিক হয়ে উঠে। আত্মকেন্দ্রিক ভাষণ তিন ধরণের হয়ে থাকে ১) পুনররুক্তি; ২) স্বগতোক্তি; এবং ৩) যৌথ স্বগতোক্তি। আবার ভাষা যখন সামাজিক হয়ে উঠে তখন শিশু ১) অন্যের সঙ্গে চিন্তা বিনিময় করে; ২) অন্যের সমালোচনা করে; ৩) অন্যকে আদেশ দেয়; ৪) অনুরোধ জানায়; ৫) ভয় দেখায়; ৬) প্রশ্ন করে; ৭) প্রশ্নের উত্তর দেয় ইত্যাদি।

৪) **নীরব কথনঃ** শিশুর অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব গোপন করতে শিখে এবং মনে মনে চিন্তা করতে শিখে। মনের ভাব প্রকাশ না কওে মনে মনে চিন্তা করার নামই নীরব কথন।

৫) **কণ্ঠস্বরের উচ্চতাঃ** কোনো কোনো শিশুর কণ্ঠস্বর স্বভাবতই ভারী হয়, আবার কারো কারো কণ্ঠস্বর হয় নিচু।

৬) **উচ্চারণ ত্রুটিঃ** শিশু যা শোনে তাই উচ্চারণ করে। অনেক সময় শিশু পরিচিতজনের কাছ থেকেও ভুল উচ্চারণ শিখে থাকে। যেসব শিশুর শ্রবণশক্তি ভালো, তাদের ভুল সংশোধন করে দিলে তারা দ্রুত সঠিক উচ্চারণ শিখে নেয়। আবার শিশুর শ্রবণশক্তি দুর্বল হলে তাদের দৃষ্টিশক্তি ও স্পশানুভূতির সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৭) **তোতলামিঃ** অনেক সময় কথা বলতে গিয়ে শিশু ইতস্তত করে, বার বার একটি শব্দ বলে বা শব্দের আদি অক্ষর উচ্চারণ করে। শিশুর এই ভাষা বিকৃতির নামই তোতলামি। তোতলামি ভাষা বিকাশের এক বড় বাধা। তোতলামি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হলো শিশুর সঙ্গে সহানুভূতিমূলক আচরণ করা। শিশুকে এর জন্য উপহাস, তিরস্কার বা ধীরে কথা বলার উপদেশ দিলে তাতে আরো উল্টো ফল হতে পারে।

ভাষা শিক্ষার অন্তরায়ঃ বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো শিশু ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। ভাষা শিক্ষার অন্তরায়ের উপাদানগুলো এখানে তুলে ধরা হলো-

১) **বুদ্ধিঃ** বুদ্ধির সঙ্গে ভাষা শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সব বুদ্ধিমান শিশুই যে তাড়াতাড়ি কথা শিখতে পাওে তা নাও হতে পাওে, তবে যেসব শিশু তাড়াতাড়ি কথা শিখে তারা সাধারণত বুদ্ধিমান হয়।

২) **স্বাস্থ্যঃ** দুর্বল স্বাস্থ্যের শিশুরা সাধারণত দেরিতে কথা শিখে, তাদের কথা বলার স্পৃহাও কম থাকে। তদুপরি দুর্বল শিশুদের পিতা-মাতারা তাদের সমস্ত দরকার আগে থেকেই পূরণ করে থাকেন বলে শিশুদের কথা বলার দরকার কম হয় এবং তাদের কথা বলতে বিলম্ব হয়। বধিরতা এবং ধীর শ্রবণশক্তিও শিশুদের কথা বলার অন্তরায় হয়।

৩) **লিঙ্গ ভিন্নতাঃ** শৈশবে ছেলে শিশুরা ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে মেয়েদের থেকে অগ্রসর থাকে। কিন্তু শৈশব অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের থেকে এগিয়ে যায়।

৪) **সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশঃ** যে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশে শিশুর বয়োবৃদ্ধি ঘটে, তার প্রভাব শিশুর ভাষা বিকাশে ভুমিকা রাখে। উন্নত এবং মার্জিত পরিবেশে যেসব শিশু বেড়ে উঠে তাদের ভাষা উন্নত এবং মার্জিত হয়, শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। অন্যদিকে দরিদ্র পরিবেশে বেড়ে উঠা শিশুদেও ভাষা অনুন্নত হত কারণ তারা মার্জিত ভাষা ব্যবহার দেখে না।

৫) **পারিবারিক সম্পর্কঃ** নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক শিশুর ভাষা বিকাশে সহায়তা করে। শিশুরা যদি বাড়িতে কথা বলার উতসাহ পায় ও স্বাধীনতা পায়, তার ভাষা শিক্ষার দ্রুত উন্নতি ঘটে।

৬) **দ্বিভাষাঃ** শিশুকে একই সময়ে দুটি ভাষা শিক্ষার প্রচেষ্টা শিশুর ভাষা শিক্ষার অন্তরায় হতে পারে। এমন যদি হয় শিশুর বাড়ির পরিবেশে যদি এক রকম ভাষা ব্যবহার হয় এবং বিদ্যালয়ে যদি অন্য ভাষা ব্যবহার হয় তবে শিশুর ভাষা শিক্ষার গতি ধীর হতে পারে। এজন্য এখন শিক্ষাবিদ গণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা শুরুর কথা বলছেন।

যোগাযোগ

প্রতিনিয়ত আমরা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। কার্যকর এবং সহজবোধ্যভাবে তথ্য বা মতামত প্রকাশ করার দক্ষতাই যোগাযোগ দক্ষতা। ভাষা ছাড়া আরও বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার মানে যোগাযোগ মৌখিক এবং অমৌখিক হতে পারে। যেমন- অভিব্যক্তি এবং লিখিত বার্তা ব্যবহার করে তথ্য, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করি। যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রবণ, উপস্থাপন শৈলি, আগ্রহের সঙ্গে বার্তা দেয়া-নেয়ার দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগ ভূমিকা রাখে। যোগাযোগ ছাড়া চারপাশের পরিবেশের সাথে যুক্ত হওয়া যায় না।

সঠিক যোগাযোগ সংঘটনের জন্য প্রয়োজন একজন ব্যক্তির, যার সাথে যোগাযোগ করা হবে এবং একটি বিষয়, যার উদ্দেশ্যে কথা বলা হবে। যোগাযোগের জন্য যে সকল দক্ষতাগুলো প্রয়োজন তা হলো-

১. **খেলা:** শিশু নিজের হাত পা দিয়ে খেলে। এই শব্দ শুনে সে আনন্দ পায়। বয়সের সাথে সাথে খেলার মধ্য দিয়ে অনেক জটিল এবং কঠিন শব্দ উচ্চারণ করে যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করে।
২. **শোনা:** শিশু খেলতে খেলতে বিভিন্ন আওয়াজ বা শব্দের প্রতি মনোযোগী হয়। শব্দের বিভিন্নতা বুঝতে পারে।
৩. **অনুকরণ করা:** জীবনের শুরতেই মা এবং যত্নকারী শিশুর আওয়াজ অনুকরণ করেন। শিশুটিও তাদের অনুকরণ করে। খেলার ছলে অনুকরণ করা পালাক্রমে রূপ নেয়।
৪. **পর্যায়ক্রমিক পালা:** একটু পরিপক্ক হলে শিশু কাঠামোবদ্ধভাবে পালাক্রম অনুসরণ করে যোগাযোগ করতে পারে।
৫. **মনোযোগ:** জন্মের পর শিশু মায়ের মুখের দিকে তাকায়, খেলতে খেলতেই শিশু আর্কষণীয় জিনিসের প্রতি, উচ্চ শব্দ, চলমান জিনিসের প্রতি মনোযোগী হয়। অর্থাৎ শিশুর মনোযোগের পরিসর বাড়ে।
৬. **বোধশক্তি:** মনোযোগ সহকারে দেখা, শোনার ফলে শিশু বিষয়টি বুঝতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধারণার পরিসর বাড়ে।
৭. **শব্দহীন যোগাযোগ/দেহভঙ্গি:** শুরুতে কান্নার মধ্য দিয়ে যোগাযোগ শুরু হয়-মা শিশুর কান্নায় সাড়া দেন। এই যোগাযোগ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আরও পরিশীলিত করে শিশু যোগাযোগ করে।
৮. **কথা:** সবশেষে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী পন্থায় অর্থাৎ কথার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতে শেখে।
৯. যোগাযোগ শিশুকে বন্ধুদের সাথে, পরিবারে কার্যকরী আন্তঃসম্পর্ক ত্বরিতে এবং জীবনকে সহজ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

অংশ-খ: শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া ও শিক্ষকের করণীয়

বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য শিশুর মধ্যে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক তার শারীরিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। যেমন-

- শিশু নিয়মিত শারীরিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। যেমন- দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ, হাঁটা-চলা, সবার সঙ্গে মিলে মিশে খেলাধুলা, সহজ গৃহস্থালি কাজ ইত্যাদি নিজে নিজে করতে পারে।
- যেকোনো ধরনের নড়াচড়া অনুকরণ করতে পারে, বাই-সাইকেল চড়তে চালাতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, গাছে বা উঁচু স্থানে চড়তে পারে, শরিরের বিভিন্ন অংশের গতিময়তা সমন্বয় করতে পারে।
- পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে ধারণা রাখে এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে আগ্রহী হয়।
- শরিরচর্চার গুরুত্ব পুষ্টিকর খাবার বুঝতে পাওে এবং নিয়মিত খেলাধুলায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহন করতে চায়।

- সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারে এবং
- বয়োসপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা করতে পারে।
- বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়া এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারা।
- নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা প্রাথমিক রাখে এবং সে অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শেখে।
- শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং নিজে এই পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারে।

শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা

- পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়া এবং পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা
- নিয়মিত খেলাধুলায় অংশ না নেওয়া
- বাড়িতে কোনোরকম পেশি সঞ্চালনার কাজে যুক্ত না থাকা
- নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা না থাকা
- পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সুস্থ শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং শিশুকে প্রয়োজনীয় সুযোগ না দেয়া
- শিশুর অসুস্থতা
- দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ, হাঁটা-চলা, সবার সঙ্গে মিলে মিশে খেলা ধুলা, সহজ গৃহস্থালি কাজ ইত্যাদি নিজে নিজে করার ব্যপারে অনীহা

শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশে শিক্ষকের করণীয়

- পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা
- শ্রেনিকক্ষে শিশুকে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ, হাঁটা-চলা, সবার সঙ্গে মিলে মিশে খেলাধুলা, সহজ গৃহস্থালি কাজ ইত্যাদি নিজে নিজে করার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে বলে এগুলো করতে উৎসাহ দেয়া
- বিভিন্ন পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা

- শিশুকে তার নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং তার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রেষণা দেয়া
- পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সুস্থ শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেয়া- হোম ভিজিট, অভিভাবক সমাবেশে এ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া যেতে পারে
- প্রয়োজনে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিশু যেন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং নিজের পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারে সে ব্যপারে তাকে সাহায্য করা। শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে না করে ব্যক্তিগতভাবে করা যেতে পারে

অধিবেশন-৯	শিরোনাম: শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক-আবেগিক বিকাশ প্রক্রিয়া ও শিক্ষকের করণীয়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশ সম্পর্কে ব্যখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ শিক্ষকের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রাথমিক স্তরের শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	সহায়ক তথ্য-৯

অংশ-ক: শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশ

শিশুর বিকাশকে যে চারটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও রয়েছে। বয়সের সাথে সাথে শিশু বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করতে থাকে, যেমন- কোন কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, সমস্যা সমাধান করা, যুক্তিপূর্ণভাবে কোন কিছু বুঝা এবং বুঝানো ইত্যাদি। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বলতে শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে এই যৌক্তিক আচরণের উন্মেষ ঘটাকে বুঝানো হয়। শিশু তার আশেপাশের মানুষ এবং পরিবেশের সাথে তার সক্রিয় মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা অর্জন করে।

সুইডিশ মনোবিজ্ঞানী জ্যঁ পিয়াঁজে সর্বপ্রথম শিখনের ক্ষেত্রে শিশুর এই সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে শিশুর শিখন শুধুমাত্র তার পিতা-মাতা বা শিক্ষক কর্তৃক প্রাপ্ত শিক্ষাতেই থেমে থাকে না, বরং সে নিজে নিজে প্রতিদিন পরিবেশ থেকে নতুন নতুন জিনিস শেখে। পিয়াঁজে জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত (যা তার পরবর্তী জীবনের ভিত রচনা করে) শিশুর এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন; এমন না যে সব শিশু একই বয়সে একই স্তর অতিক্রম করবে, তবে প্রত্যেককেই একটি স্তর অতিক্রম করে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করতে হবে। নিচে পিয়াঁজে বর্ণিত শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের স্তররগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। ইন্দ্রিয়-পেশীর সমন্বয়কাল (Sensorimotor stage): ০-২ বছর

এই বয়সে শিশু তার হাত-পা বা শরীর নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়ে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিবেশ থেকে নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে শেখে। এই সময়ে শিশুর বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে সাধারণত সে যা পেতে চায় তার জন্য সে কীভাবে তার পেশী এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে কাজে লাগাচ্ছে তার মধ্যমে।

২। প্রাক-প্রায়োগিক স্তর (Pre-operational stage): ২ বছর-৬/৭ বছর

এই বয়সে শিশু ধীরে ধীরে প্রতীকের ব্যবহার (ভাষা, ছবি, ইশারা ইত্যাদি) বুঝতে শিখে; যদিও বাস্তব উপকরণের সাহায্যেই তার শিখন বেশি কার্যকর হয়। শিশু এই বয়সে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা (Ego centrism) করে, তার মধ্যে সংরক্ষণের ধারণা (Concept of conservation) তৈরি হয় না এবং বিভিন্ন বস্তুকে সে একাধিক বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে সাজাতে পারে না (Decentring)।

৩। বাস্তব প্রায়োগিক স্তর (Concrete Operational stage): ৮-১১ বছর

এই বয়সে শিশু ধীরে ধীরে বিমূর্ত চিন্তা করতে শেখে; পাশাপাশি যুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে শিখে। এই পর্যায়ে তাদের মধ্যে সংরক্ষণের ধারণা তৈরি হয়। সে আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে শিখে। এছাড়া এই সময়েই শিশু বিভিন্ন বস্তুকে সে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে সাজাতে (Seriation এবং Decentring) শিখে। বস্তুর অবস্থা বা ঘটনার বিপরীতমুখীতা (reversibility)ও সে এই বয়সে বুঝতে শিখে।

৪। রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক স্তর (Formal Operational stage): ১১ বছর+

এই স্তরে শিশুরা পুরোপুরি বিমূর্ত চিন্তা করতে সক্ষম হয়। সে সুদূর অতীতের কথা মনে করতে পারে কিংবা ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করতে পারে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাসমূহঃ

যেহেতু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-প্রায়োগিক এবং বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের শিখন প্রযোজ্য, আমরা এখানে এই দুই স্তরে শিশু যে বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাগুলি অর্জন করে সে সম্পর্কে জানব।

যেহেতু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-প্রায়োগিক এবং বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের শিখন প্রযোজ্য, আমরা এখানে এই দুই স্তরে শিশু যে বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাগুলি অর্জন করে সে সম্পর্কে জানব।

আত্মকেন্দ্রিকতা (Ego centrism): এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে শিশু মনে করে সে যেভাবে কোন বিষয় বা বস্তুকে দেখছে, অন্যরাও সেভাবেই দেখছে। অন্যের মতামত বা যুক্তি তারা বুঝতে পারে না।

সংরক্ষণের ধারণা (Concept of conservation): অবস্থা বা পাত্রের পরিবর্তন হলেই যে বস্তুর পরিমাণের পরিবর্তন হয় না- এটা বুঝতে পারা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। যেমন- ধরা যাক দুইটি একই রকম দেখতে গ্লাসে সমপরিমাণ পানি রাখা হলো। এরপর একটি গ্লাসের পানি অন্য আরেকটি লম্বা গ্লাসে ঢেলে শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন গ্লাসে বেশি পানি আছে? প্রাক-প্রায়োগিক স্তরে শিশু বলবে যে লম্বা গ্লাসে বেশি পানি আছে, অর্থাৎ তার মধ্যে সংরক্ষণের ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি; কিন্তু বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের শিশু বুঝতে পারবে যে দুটি গ্লাসেই সমপরিমাণ পানি আছে।

বিভিন্ন বস্তুকে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে সাজানো (Seriation এবং Decentring): বিভিন্ন বস্তুকে কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সাজানোকে বলে Seriation। যেমন- শিশু তার

খেলনাগুলিকে আকারের ভিত্তিতে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজাতে শিখে। আর শিশু যখন বিভিন্ন বস্তুকে একাধিক বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে সাজানো শিখে তখন তাকে বলে Decentring। যেমন- শিশু বিভিন্ন খেলনাকে একই সাথে আকার এবং রঙের ভিত্তিতে আলাদা করতে পারে।

বস্তুর অবস্থা বা ঘটনার বিপরীতমুখীতা (Reversibility): এটি বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের দক্ষতার একটি অনন্য মাত্রা। শিশু এই স্তরে কোন বস্তুর বর্তমান অবস্থা দেখে কল্পনা করতে পারে যে এটি পুনরায় তার পূর্বের/ আদি অবস্থায় ফেরত যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে- শিশুর বলের বাতাস বের হয়ে চুপসে গেলেও সে হতাশ হয়ে পড়ে না, কেননা সে বুঝতে পারে যে বাতাস দিয়ে বলটিকে ফুলিয়ে আবারো খেলার উপযোগী করা সম্ভব।

ভিডিও লিংক

Paget's Theory of Cognitive Development
https://www.youtube.com/watch?v=IhcgYgx7aAA&t=8s

প্রাথমিক স্তরের শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ

এরিক এরিকসন বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মানবজীবনের বিকাশকে সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য মনো-সামাজিক তত্ত্ব প্রদান করেন। এই তত্ত্বে তিনি সমগ্র মানবজীবনকে ৮টি স্তরে ভাগ করেছেন এবং প্রতিটি স্তরে কিংবা বয়সে বিকাশের প্রক্রিয়া এবং বিকাশের ফলাফল ব্যাখা করেছেন। এরিকসন বলেছেন, একজন ব্যক্তিকে জীবনভর বিকাশের এই ৮টি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং জৈবিক ও সামাজিক এই দুই ধরনের শক্তির সাথে সমঝোতা করে চলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক বছরের শিশুকে কোলে তুলে উপরে ছুঁড়ে মারলে সে খুব আনন্দ পায় এবং হাসে কারণ এই সময়ে শিশু সবার উপর আস্থা রাখতে পারে। এবং এই সময়েই শিশু চারপাশের জগতকে নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু শিশু যদি খেলতে খেলতে ব্যাথা পায় তাহলে তার মধ্যে চারপাশের জগত সম্পর্কে একটি অনাস্থা তৈরি হয় এবং এই অনাস্থার কারণে পরবর্তী খেলার সময় সে একধরণের সতর্কতা অবলম্বন করে। এই অনাস্থা নিয়ে সে যখন বিকাশের পরবর্তী ধাপে পদার্পণ করে তখন সে চারপাশের জগত সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে। এভাবে বিকাশের এক স্তরের প্রক্রিয়া এবং ফলাফল অন্য স্তরকে প্রভাবিত করে।

এরিকসন প্রস্তাবিত মনো-সামাজিক বা সামাজিক-আবেগিক বিকাশের আটটি ধাপ হলো-

১। আস্থা বনাম অনাস্থা (Trust vs. Mistrust): ০-১ বছর

২। ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম লজ্জা ও সংশয় (Autonomy vs. Shame & Doubt): ১-৩ বছর

৩। কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ (Initiative vs. Guilt):৩-৬ বছর

৪। পরিশ্রম বনাম হীনমন্যতা (Industry vs. Inferiority): ৬-১২ বছর

৫। স্বকীয়তা বনাম দ্বিধা (Identity vs. Confusion): ১২-২০ বছর

৬। ঘনিষ্ঠতা বনাম বিচ্ছিন্নতা (Intimacy vs. Isolation): ২০-৪০ বছর

৭। উৎপাদনশীলতা বনাম স্থবিরতা (Generativity vs. Stagnation): ৪০-৬০ বছর

৮। সম্পূর্ণতা বনাম নিরাশা (Ego Integrity vs Dispair): ৬০ বছর+

যেহেতু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের বিকাশ প্রযোজ্য, আমরা এখানে এই দুই স্তরে শিশু যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে সে সম্পর্কে জানব।

পর্যায়সমূহ	দ্বন্দ্ব	সন্তোষজনক ফলাফল	অসন্তোষজনক ফলাফল
৩-৬ বছর	(Initiative vs. Guilt)	নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে শিখে এবং চারপাশের জগতকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নতুন কাজ বা খেলার মাধ্যমে সবার আকর্ষণ পেতে চায়। কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ এসময়ই শিশুদের মধ্যে কোন কাজের উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষমতা তৈরি হয়।	শিশুর আচরণগুলো এই সময় মিনিংফুল বা অর্থপূর্ণ হয়। যদি কোন শিশু অনেক বেশী চেষ্টা করেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয় অথবা বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোন খেলা বা নতুন কোন কাজের জন্য প্রশংসা বা সমর্থন না পায় তাহলে শিশুর মনে এক ধরনের অপরাধবোধ তৈরি হয়।
৬-১২ বছর	পরিশ্রম বনাম হীনমন্যতা (Industry vs. Inferiority)	শিশু এই সময়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করে এবং এই বয়সের বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ভূমিকা রাখেন। পরীক্ষা, ক্লাস পারফর্মেন্স, খেলাধুলা এসবের মাধ্যমে শিশু নিজেকে কর্মদক্ষ মনে করে।	যদি শিশু এই সময়ে স্কুলে পারফর্মেন্স খারাপ করে কিংবা ব্যর্থ হয়, এবং শিক্ষকগণ যদি সে কারণে শাস্তি দেয় বা সমালোচনা করেন তখন শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা বোধ তৈরি হয়।

ভিডিও লিংক

8 stages of development by Erik Erikson
https://www.youtube.com/watch?v=aYCBdZLCDBQ&t=1s

অংশ-খঃ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের ভূমিকা

এই পর্যায়ে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব প্রাথমিক স্তরের শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য শিক্ষক কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন।

আমরা যদি প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে শুরুর দিকে তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা -ভাবনা (Ego centrism) কাজ করে। তারা অন্যের দিকটা বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক ভূমিকাভিনয়ে শিশুকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে অন্যের দিক বুঝতে সাহায্য করতে পারেন। আবার এই বয়সে শিশুরা বাস্তব উপকরণ দিয়ে শিখতে বেশি পছন্দ করে; কাজেই এই সময়ে শিশুর জন্য যত বেশি সম্ভব বাস্তব উপকরণভিত্তিক কাজ বা খেলার আয়োজন করতে হবে।

আবার শিশু যখন আরেকটু বড় হয়, তখন সে যুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা শিখে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে। কিংবা, যেহেতু তারা সমাজে প্রচলিত প্রতীকী নিয়ম-কানুন বা মূল্যবোধ বোঝা শুরু করে, সামাজিক নাটক/ ভূমিকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের চেষ্টা করা যেতে পারে। আবার, বিভিন্ন বস্তু/ প্রাণীকে একাধিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো বা বিন্যাসের সক্ষমতা তৈরির জন্য শিক্ষক এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে কোন বিষয়ে যে কোন খেলা বা কার্যক্রম আয়োজন করতে পারেন।

সর্বোপরি বলা যায় যে, শিক্ষক যদি বয়সভেদে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ কীভাবে ঘটে সে সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারেন, তবে তিনি তার সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন খেলা বা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর এই বিকাশ তরান্বিত করতে পারবেন।

শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের ভূমিকা

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ এবং পরিশ্রম বনাম হীনমন্যতা- এই বৈশিষ্ট্যগুলি মাথায় রেখে শিক্ষক তার বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারেন। যেমন-

- শিশু কোনো কাজ করতে চাইলে পারতপক্ষে সেটিতে বাঁধা না দিয়ে বরং উৎসাহ প্রদান করা
- শিশুর যেকোনো কাজ, সেটি যতই তুচ্ছ হোক না কেন, তার প্রশংসা করা
- সকল শিশুর প্রতি সমান মনযোগ দেওয়া
- শিশুর আগ্রহ অনুযায়ী তাকে তার পছন্দের কাজ করতে দেওয়া
- কোনো শিশু নেতৃত্ব দিতে উৎসাহী হলে তাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করা
- শিশুর শিখনযোগ্যতা বা অন্য কোনো ধরনের আচরণ নিয়ে শ্রেণিকক্ষে হাসাহাসি না করা
- এক শিশুকে অন্য শিশুর সাথে তুলনা না করা ইত্যাদি

সর্বোপরি বলা যায় যে, শিক্ষক যদি বয়সভেদে শিক্ষার্থীর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ কীভাবে ঘটে সে সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারেন, তবে তিনি তার সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন খেলা বা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর এই বিকাশ তরান্বিত করতে পারবেন।

তথ্যপুস্তক

অধিবেশন-১০	**শিরোনাম: শিশুর বিকাশ ও শিখনে খেলার গুরুত্ব এবং শিক্ষকের করণীয়**

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলার গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. খেলার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিশুর বিকাশ ও শিখনে খেলার গুরুত্ব এবং শিক্ষকের করণীয়	**সহায়ক তথ্য-১০**

অংশ-ক: শিশুর বিকাশ ও শিখনে খেলার গুরুত্ব

সকল শিশুর জন্য খেলাধুলা একটি চিরন্তন বিষয়। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের সকল শিশুই কমবেশি খেলাধুলা করে। একটি শিশুর উপযুক্ত বিকাশ ও প্রাপ্ত বয়সের সাফল্যে শিশুকালের খেলাধুলার ভূমিকা রয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে এভাবে বলা যেতে পারে যে, "খেলা হলো শিশুর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমষ্টি যেখানে শিশুরা স্বেচ্ছায় আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। খেলার প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে জন্মগত। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর সমস্ত প্রাণশক্তি প্রকাশ পায়। খেলার মাধ্যমে শিশুরা নিজের, তাদের চারপাশের মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারে।"

খেলার বৈশিষ্ট্যসমূহ-

- ✓ **খেলা সহজাত:** খেলা একটি সহজাত বিষয়। শিশু তার নিজের মধ্যেই খেলার অনুপ্রেরণা অনুভব করে এবং খেলায় নিয়োজিত হয়। খেলায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে শিশুর কাছে খেলা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- ✓ **খেলা প্রতীকী ধরনের হতে পারে:** খেলা প্রতীকী ধরনের হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা মিছেমিছি খেলা করে। যেমন-তারা রান্না রান্না খেলে কিংবা বাক্সর মধ্যে বসে নৌকা চালানোর ভঙ্গি করে ইত্যাদি।

- ✓ **শিশুরাই খেলার নিয়ম ঠিক করেঃ** শিশুদের অনেক খেলার লিখিত নিয়মকানুন থাকলেও অনেক সময়ই দেখা যায় শিশুরা যখন খেলা করে তখন এর নিয়মকানুন তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয়।
- ✓ **খেলা প্রক্রিয়া নির্ভর, ফলাফল নির্ভর নয়ঃ** শিশুদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, খেলাতে প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। ফলাফলের গুরুত্ব এখানে কম।
- ✓ **খেলা আনন্দময়ঃ** খেলা সবসময়ই ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা মনের আবেগ, অনুভূতি, ভাবের প্রকাশ করতে পারে।

খেলার ধরনঃ

একাকী খেলাঃ একাকী খেলার ক্ষেত্রে শিশু স্বাধীনভাবে একা খেলা করে। কোন কোন শিশু অন্য শিশুদের সঙ্গে কথা বা ভাবের আদান-প্রদান না করে আলাদা হয়ে একাকভাবে নিজের মতো করে খেলা করে। এ ক্ষেত্রে অন্য শিশুদের সঙ্গে সমন্বয় করা বা অন্যকে সঙ্গে নেবার প্রবণতা বা কারো সঙ্গে আলোচনা করার প্রবণতা থাকে না।

সহযোগিতার ভিত্তিতে খেলাঃ একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিশুরা সহযোগিতার ভিত্তিতে দল তৈরি করে খেলা করে। সহযোগিতার ভিত্তিতে খেলার মাধ্যমে শিশুরা অনেক জটিল সামাজিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করে।

সমান্তরাল খেলাঃ সমান্তরাল খেলার ক্ষেত্রে একজন শিশু অন্য শিশুদের পাশে থেকে নিজে নিজের খেলায় নিমগ্ন থাকে এবং অন্য শিশুদের সাথে খুবই অল্প কথা বা ভাবের আদান-প্রদান করে। এ সময়ে শিশুটি একই ধরনের খেলনা নিয়ে খেললেও অন্যদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে খেলা করে না অর্থাৎ শিশুটি অন্যদের অনুকরণ করলেও তাদের সাথে একত্র হয়ে খেলা করে না।

সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে খেলাঃ এ সময়ে শিশুরা একসঙ্গে খেলা করলেও দল তৈরি হয় না। অর্থাৎ তারা এক জায়গায় বসে একে অপরের সাথে পালাক্রমে ও অল্পসময়ের জন্য খেলে। এর সঙ্গে সমান্তরাল খেলার পার্থক্যটি হলো সমান্তরাল খেলাতে শিশুরা খেলনা আদান প্রদান করে না কিংবা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে না । সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে খেলার সময় তারা খেলনা আদান-প্রদান করে এবং নিজেদের মধ্যে আলাপও করে।

শারীরিক খেলাঃ শারীরিক খেলার মধ্যে রয়েছে সক্রিয় খেলা (দৌড়, ঝাপ, লাফ, বেয়ে ওঠা, বল খেলা, সাইকেল চালনা প্রভৃতি), সুক্ষ্মপেশীজ চর্চা (বুনন, রং করা, কাটাকাটি, পরিত্যাক্ত জিনিস দিয়ে নমুনা তৈরি, ব্লক বা উপকরণ দিয়ে খেলনা তৈরি) এবং শক্তির প্রতিযোগিতা (মোরগ লড়াই, গোল্লা ছুট, দাঁড়িয়া বান্ধা ইত্যাদি) ।

উপকরণের খেলা: উপকরণের খেলায় শিশুরা তার চারপাশের পরিবেশ থেকে নানা উপকরণ খুঁজে বের করে বা প্রাপ্ত উপকরণ নিয়ে খেলে। নানা ধরনের উপকরণ খুঁজে বের করা বা প্রাপ্ত উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার সময় তাদের সুক্ষ্ম-পেশীজ, ধৈর্য্য ও কল্পনা শক্তির উন্নয়ন ঘটে এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

প্রতীকের খেলা: এই খেলার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয় যে সব খেলা যা শিশুরা অর্থপূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য খেলে। এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়- মুখের ভাষা, ইশারা-ইঙ্গিত, চিহ্ন, লেখা, সংখ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি।

কল্পনার খেলা: কোন বিষয়কে কল্পনা করে শিশুরা একা বা সাথিদের সাথে অভিনয় করে খেলা করে। শিশুরা তাদের দেখা পূর্বের কোন ঘটনা বা বিষয়ের অনুরূপ কিছু অভিনয় করে এই খেলা করে থাকে। কোন একটা কিছুকে নিয়ে ভিন্নভাবে ব্যবহার করে বা কোন একটা চরিত্রে অভিনয় করে শিশুরা কল্পনার খেলা করে থাকে। যেমন- রান্না করা, ব্লককে গাড়ি হিসেবে চালানো, ডাক্তার হয়ে চিকিৎসা করা, শিক্ষকের মতো করে পড়ানো, গৃহস্থালির কাজ করা ইত্যাদি।

নিয়ম মেনে খেলা: চারপাশের জগৎ সম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য শিশুরা নিয়ম মেনে খেলার ক্ষেত্রে খুব আগ্রহী হয় এবং তারা এসব খেলা উপভোগ করে। এসব খেলার মধ্যে রয়েছে- ছোঁয়াছুয়ি, লুকোচুরি, বরফপানি, বল ছোঁড়া ও ধরা প্রভৃতি।

গঠনমূলক খেলা: শিশু নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে যা কিছ তৈরি করে এরূপ খেলাকেই গঠনমূলক খেলা বলে। এ ধরনের খেলাতে একটি গঠনমূলক চিন্তা বা পরিকল্পনা থাকে। শিশু একক বা দলে চিন্তার সমন্বয়ে গঠনমূলক খেলা করে থাকে।যেমন- ব্লক দিয়ে ঘরবাড়ি, গেট বা পুল বানানো ইত্যাদি।শিশুদের কোন একটি খেলায় উপরে উল্লেখিত খেলার ধরনগুলির বর্ণনাকৃত বৈশিষ্ট্যের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে পারে।

শিশুর বিকাশে খেলার গুরুত্ব-

শিশুর বিকাশে খেলার গুরুত্ব অপরিসীম। খেলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও সামাজিক বিকাশ সবচেয়ে বেশি ঘটে। যেমন-

- খেলা শিশুকে তার শরীর ও চলাচলে প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়
- শিশুর সূক্ষ্ম ও স্থুল পেশীর সঞ্চালনের দক্ষতা বাড়ে
- খেলার মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও প্রশান্তি লাভ করার সুযোগ ঘটে

- শিশুর ভাষা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
- খেলা পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ও অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ তৈরি করে
- খেলা শিশুর কল্পনা ও সৃজনশীল দক্ষতা বিকাশের কাজ করে
- শিশু বিভিন্ন নিয়মনীতি ও সামাজিক আচরণ শেখে
- খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ঝুঁকি নিতে শেখে। এই ধরনের ঝুঁকি গ্রহণের অভ্যাস পরবর্তী জীবনে শিশুকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে সফল মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

শিশুর শিখনে খেলার ভূমিকা-

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে,

- খেলার মাধ্যমে শিশুর শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তীক, আবেগিক এবং সামাজিক বিকাশ হয়।
- খেলা ভিত্তিক শিখন গতানুগতিক শিখনের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ হয়। যেমন- খেলা শিশুদের কাছে শিখনের অনেক বড় সুযোগ তৈরি করে। খেলার মাধ্যমে শিশুদের আত্মসম্মান বোধ তৈরি হয় এবং শিশু সফলতার দিকে অগ্রসর হয়।
- খেলা শিশুর সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তিকে উন্নত করে।
- খেলার মাধ্যমে শিশুর শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগিক এবং সামাজিক বিকাশ হয়।
- খেলার মাধ্যমে শিশু সমস্যা সমাধান, সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকা ও শেয়ার করা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিরোধ নিস্পত্তি করতে শেখে।
- সর্বোপরি, খেলার মধ্য দিয়ে শিশু কিছু শিখলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অংশ-খঃ শিক্ষকের করণীয়

খেলার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খেলায় উৎসাহিত করবেন এবং সহযোগিতা করবেন।
- খেলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- প্রয়োজনে খেলাটি কীভাবে খেলতে হয় তা দেখিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক খেলার কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন না এবং খেয়ায় বাধা দিবেন না।
- খেলার সময় অন্য সহপাঠীদেও সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা দিবন।

- খেলার জন্য উপযুক্ত এবং নিরাপদ পরবেশ নিশ্চিত করবেন।

অধিবেশন- ১১	শিরোনাম: শিশুর বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের ধারণা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর শারীরিক এবং মনো-সামাজিক বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিশুর শারীরিক এবং মনো-সামাজিক বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিশুর বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম	সহায়ক তথ্য-১১

অংশ-ক: সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের ধারণা ও গুরুত্ব

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের ধারণা: একটা সময় ছিল যখন শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সমাজসেবা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সময়ের অপচয় কিংবা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বলে ধারণা করা হতো। কালের বিবর্তনে এসব বিষয়গুলোকে নতুন নামকরন করা হয়েছে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম যা শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ যোগ্য নাগরিক হতে হলে তার শারীরিক এবং মনোসামাজিক বিকাশ প্রয়োজন।

যে সব কার্যবলি শিশুর শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি তার শারীরিক এবং মনোসামাজিক বিকাশে সহায়ক এবং তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে, শিক্ষাক্রমের সহযোগী সেই বিষয়গুলো বা কার্যাবলিসমূহকে সহশিক্ষাক্রমি কার্যক্রম বলে। মনোবিদ এইচ. এন. রিভলিন বলেন, যেসব কার্যাবলি শিক্ষার্থীর বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের সাথে জীবনবিকাশের অন্য দিকগুলোকেও সার্থক করে তোলে, তাদেরকে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বলে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব:

১। শিশুর দৈহিক এবং মনোসামাজিক বিকাশে সহায়তা করে।

২। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর গণতান্ত্রিক মনোভাব বিকাশে সহায়তা করে।

৩। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত করে।

৪। শিশুর চাহিদাভিত্তিক বিকাশ গড়ে তোলে।

৫। শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

৬। শিশুর সহযোগিতা এবং সমবেদনামূলক মনোভাব গড়ে তোলে।

৭। শিশুকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

৮। শিশুকে পাঠের একঘেঁয়েমি দূর করতে সহায়তা করে।

৯। শিশুকে বিদ্যালয় নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে।

১০। শিশুর জীবনে শৃঙ্খলা স্থাপনে সহায়তা করে।

১১। শিশুর সামাজিক বৈশিষ্ট্য গঠনে সহায়তা করে।

১২। শিশুর বিভিন্ন প্রকার সৃজনশীল গুনের বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

১৩। শিশুর সেবামূলক মনোভাব বিকাশে সহায়তা করে।

১৪। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি শিশুকে আনন্দ এবং তৃপ্ত করে।

১৫। এটি শিক্ষার্থীর জাতীয় সংহতি বা জাতীয়তাবোধের বিকাশে সহায়তা করে।

১৬। এটি শিশুকে সক্রিয়তাভিত্তিক শিখনে সহায়তা করে, ইত্যাদি।

বিদ্যালয় পর্যায়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমসমূহঃ

ক। বিতর্ক অনুষ্ঠান, কুইক কুইজ, নাচ-গান, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি।

খ। খেলাধুলা, বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা প্রতিযোগীতা, সাঁতার/কাবাডি/লুডু/ক্যারম/দাবা খেলা, স্কাউট/গালস গাইড/হুলদে পাখি ইত্যাদি।

গ। ফুলের বাগান, সবজি বাগান, ফলের বাগান, বৃক্ষরোপন সাপ্তাহ, মৎস চাষ ইত্যাদি।

ঘ। স্বাক্ষরতা সাপ্তাহ, শিক্ষা সাপ্তাহ পালন, উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

ঙ। বার্ষিক ম্যাগাজিন, দেয়ালিকা প্রকাশ, শিক্ষা সফর, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালন ইত্যাদি।

শিশুর শারীরিক বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম-

যেসব শরীর চর্চার কার্যাবলি শিশুর/শিক্ষার্থীর দেহ, মন এবং কর্মদক্ষতাসহ নানান সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়, সেগুলোই শিশুর শারীরিক বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বলে পরিচিত।

যেমন, ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, কাবাডি খেলা, ক্যারম খেলা, ব্যায়াম ইত্যাদি।

শারীরিক বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের ভূমিকা:

১। এটি শিশুর শারীরিক জড়তা নিরসন করে।

২। শিশুর আনন্দ লাভ করতে সহায়ক।

৩। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম শিশুর বিনোদনের একটি কার্যকর কৌশল।

৪। এটি শিশুর পেশি সঞ্চালনে দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

৫। এটি শিশুর মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৬। এটি শিশুর শরীর এবং চলাচলে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।

৭। এতে শিশুর সূক্ষ্ম এবং স্থুল পেশির সঞ্চালনের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে।

৮। এতে শিশুর কল্পনা বিকাশে সাহায্য করে।

৯। এর মাধ্যমে শিশু তার চোখের এবং হাতের কাজের সমন্বয় করতে পারে।

১০। এটি শিশুকে ঝুঁকি নিতে এবং সেই ঝুঁকি মোকাবেলা করতে শেখায়।

শিশুর মনো-সামাজিক বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম:

যেসব সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি শিশুর বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশ ও বিকাশের সম্প্রসারণে এবং সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সাহায্য করে, সেই সব কার্যাবলিকে মনো-সামাজিক সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বলে।

যেমন, শিক্ষা সাপ্তাহ পালন, বৃক্ষরোপণ সাপ্তাহ, হাত ধোঁয়া দিবস পালন, বার্ষিক ম্যাগাজিন, দেয়ালিকা প্রকাশ, শিক্ষা সফর, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালন ইত্যাদি।

মনো-সামাজিক বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম ভূমিকা:

১। সবার সাথে মিলেমিশে খেলতে পারবে।

২। সহযোগিতার মনোভাব বাড়াবে।

৩। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার দক্ষতা বাড়াবে।

৪। অন্যের আচরণ অনুকরণ করতে পারবে।

৫। অন্যের সাথে ভাগ করতে শিখবে।

৬। শিশু তার প্রতিদিনের কাজকর্ম ঠিক মতো করতে শিখবে।

৭। শিশু সবার সাথে মিশতে শিখবে।

৮। নিজের আবেগ, আনন্দ, রাগ বুঝতে এবং প্রকাশ করতে শিখবে।

৯। সহপাঠীর সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারবে।

১০। সহপাঠী, শিক্ষক এবং অন্যান্যদের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ করতে শিখবে।

১১। সহপাঠী, শিক্ষক এবং অন্যান্যদের প্রতি মূল্যবোধ প্রদর্শন করতে পারবে।

১২। নিজের এবং সহপাঠীর উপর আস্তা এবং বিশ্বাস তৈরি করতে শিখবে।

১৩। অন্যের চিন্তা, অনুভূতি, মতামত এবং চাহিদার প্রতি সম্মান রেখে নিজের অনুকূলে মত প্রকাশ করা বা সিদ্ধান্ত জানাতে পারবে।

১৪। সুস্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে পারবে।

১৫। অন্যের সাথে অসচেতনভাবে কাজ করার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

অংশ-খঃ সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম অনুশীলন

১। বিতর্ক প্রতিযোগীতার আয়োজন

১ম বক্তা: পক্ষদলের প্রথম বক্তা বিষয়টিকে সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়ন করবেন, বিষয়ের পক্ষে দলের অবস্থান স্পষ্ট করবেন এবং সম্ভাব্য ১/২টি যুক্তি খন্ডন করবেন। অন্যদিকে বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা পক্ষদলের প্রথম বক্তার দেয়া সংজ্ঞায়নের মেনে নেয়া অংশ বাদে যদি প্রয়োজন হয় বাকী মূল শব্দগুলোর সংজ্ঞায়ন করবেন। বিষয়ের বিপক্ষে দলের অবস্থান স্পষ্ট করবেন এবং ১ম বক্তার ২/৪টি যুক্তি খন্ডন করবেন।

২য় বক্তা: পক্ষদলের ২য় বক্তা বিপক্ষ দলের ১ম বক্তার দেয়া দলীয় কৌশল এবং অবস্থানের ব্যাখ্যা করবেন এবং তা খন্ডন করে বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তি এবং উদাহরণের মাধ্যমে ১ম বক্তার মতো তার দলের পক্ষে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবেন। অন্যদিকে বিপক্ষ দলের ২য় বক্তাও পক্ষদলের ২য় বক্তার ন্যায় তার দলের বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবেন।

দলনেতা: পক্ষদলের দলনেতা তার প্রথম ও ২য় বক্তার বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব, যুক্ত ও উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করবেন। অন্যদিকে বিপক্ষ দলের দলনেতাও তার দলের পক্ষে বিষয়টিকে প্রমাণ করে যাবেন।

যুক্তিখন্ডন পর্ব: পক্ষ দলের দলনেতা বিপক্ষ দলের তিনজন বক্তার প্রদত্ত যুক্তিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলো ধরে ধরে খন্ডন করে তাদের যুক্তিকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবেন। অন্যদিকে বিপক্ষ দলের দলনেতাও পক্ষদলের প্রদত্ত যুক্তিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলো খন্ডন করে তাদের যুক্তিকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবেন।

মডারেটর: বিতর্কের সময় নির্ধারণ করে দিবেন। প্রত্যেক বক্তাকে ৩-৫ মিনিট কওে (১মিনিট পূর্বে সতর্ক সংকেত বাজাতে হবে) এবং যুক্তি খন্ডন পর্বে উভয় দলের দলনেতাকে ২ মিনিট করে সময় দিবেন। (১.৫মিনিট পূর্বে সংকেত বাজাতে হবে। প্রত্যেক বক্তার সংজ্ঞায়ন, উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, তথ্য, তত্ত্ব, এবং উদাহরণ প্রদান করে যুক্তি প্রয়োগ এবং খন্ডন ইত্যাদি বিষয়ে নম্বর প্রদান করবেন।

২। দেয়ালিকা তৈরি

দেয়ালিকা হলো কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ছড়া, কৌতুক, অংকন ইত্যাদির সমন্বিত একটি সাময়িকপত্র। এটি মাসিক, ত্রৈমাসিক, ঋতুভিত্তিক, ষন্মাসিক, বার্ষিক হতে পারে। এটি শিক্ষকের নেতৃত্বে তৈরি হয়ে থাকে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক দেয়ালিকার মাঝ বরাবর বা একপাশে সম্পাদকীয় লিখে দিবেন। দেয়ালিকায় প্রবন্ধের পাশে গল্প, গল্পের পাশে স্মৃতিকথা বা ছড়া বা কবিতা, প্রবাদ-প্রবচন, শিক্ষণীয় হাস্যরস, কৌতুক ইত্যাদি শিরোনাম দিয়ে লিখবেন। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন আঁকাআঁকি বা বিভিন্ন কালারের কলমের ব্যবহার করা যাবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক অবশ্যই বানানের প্রতি বিশেষ নজর দিবেন। স্পষ্ট এবং সুন্দর হাতের লেখা হবে।

৩। গল্প বলার প্রতিযোগিতা

শিক্ষক গল্প বলার প্রতিযোগিতা আয়োজনের ঘোষণা দিবেন। সেখানে কি কি ধরণের গল্প বলা যাবে তার লিস্ট দিবেন। কত শব্দের মধ্যে গল্পটি বলতে হবে সেটা নির্ধারণ করে দিবেন। গল্পে কোনো ধরণের সামাজিক রীতিনীতির বিরোধী বিষয়বস্তু থাকবে না। গল্পের মাধ্যমে কাউকে গালি, বিদ্রূপ বা আক্রমণ করা যাবে না। প্রত্যেক প্রতিযোগিকে গল্পে কি কি বিষয় বিবেচনায় নেয়া হবে সেই জন্য রুব্রিক দিবেন। সেরা গল্পকার নির্ধারণ করবেন।

৪। বৃক্ষরোপন সপ্তাহের আয়োজন

বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপন সপ্তাহে কি কি আয়োজন করা যায় তা তালিকা তৈরি করবে। কি কি ধরণের বৃক্ষরোপন করা হবে তার তালিকা তৈরি করবে। কতগুলো বৃক্ষরোপন করবে তার তালিকা করবে। কোন স্থানে কি ধরণের গাছ লাগবে তার তালিকা প্রণয়ন করবেন। গাছে নিরাপত্তার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিবে তার তালিকা করবে।

৫। বিজ্ঞানমেলার আয়োজন

বিজ্ঞানমেলার আয়োজনের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন। আমন্ত্রণপত্র তৈরি করবেন। কত স্টল দেয়া যাবে তার জন্য প্রয়োজনী স্থান বাছাই করবেন। বিচারক কমিটি গঠন করবেন। বিচারকার্যের জন্য রুব্রিক নির্ধারণ করে দিবেন। মেলায় প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি ঘোষণা করবেন।

অধিবেশন-১২	শিরোনাম: শিশুর বিকাশে খাদ্যাভ্যাস

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর খাদ্যাভ্যাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর বিকাশ এবং আচরণের উপর খাদ্যের উপাদানসমূহের প্রভাব চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিশুর বিকাশে খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

শিশুর বিকাশে খাদ্যাভ্যাস	সহায়ক তথ্য-১২

অংশ-ক

খাদ্যের ধারণা

যে সকল দ্রব্য খেলে শরীরের ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি পায় এবং শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা যায়, তাই খাদ্য।

খাদ্যে ৬ ধরণের উপদান থাকে।

১। আমিষ বা প্রোটিন

২। শর্করা বা কার্বোহাড্রেট

৩। স্নেহ বা চর্বি জাতীয়

৪। খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

৫। খনিজ লবণ

৬। পানি

পুষ্টির ধারণা:

খাদ্যের উপাদানসমূহ যে প্রক্রিয়ায় মানবদেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, বৃদ্ধি, তাপ ও শক্তি যোগান এবং দেহকে সবল ও রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে, তাকেই পুষ্টি বলে।

সুষম খাদ্য:

যে খাদ্যে খাদ্যের প্রয়োজনীয় ৬টি উপাদান নির্দিষ্ট পরিমানে ও সঠিক অনুপাতে থাকে এবং শরীরের যাবতীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

ওয়ার্কশীটঃ দলীয় কাজের তালিকা

দল-১। শর্করা বা কার্বোহাড্রেটঃ চিনি, গুড়, মিছরি, শরবত, মুড়ি, চিড়া, রুটি, আটা, ময়দা, আলু, মধু, খেজুর, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

দল-২। আমিষ বা প্রোটিনঃ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদি।

দল-৩। স্নেহ বা চর্বি জাতীয়ঃ তেল, ঘি, ডালডা, মাখন, চর্বি ইত্যাদি।

দল-৪। খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন এবং খনিজ লবণঃ আপেল, লাল শাক, কমলা, পেপে, কচু শাক, সবুজ শাক সবজি, বিভিন্ন প্রকারের ফল ইত্যাদি।

খাদ্যাভ্যাসঃ

সমগ্র বিশ্বে জাতিগত, ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কারণে খাদ্যাভ্যাসের প্রচলন দেখা যায়। যেমন, বাংলাদেশে সমতল অঞ্চল এবং পাহাড়ি অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন। বাসবাসের স্থান, খাদ্য উপকরনের সহজলভ্যতা, শারীরিক চাহিদাপূরণ, পারবিবারিক এবং সামাজিক মানুষ যেই ধরনের খাদ্য গ্রহণে অবস্ড় হয়ে পড়ে সেটি খাদ্যাভ্যাস নামে পরিচিত।

খাদ্যাভ্যাস গঠন চার্টঃ

১। পারিবারিক গঠন

২। সামাজিক প্রথা

৩। পারিবারিক আয়

৪। শিক্ষার স্তর

৫। খাদ্য উপকরণের সহজলভ্যতা

৬। ব্যক্তিগত রুচি

৭। চাকুরি ও পেশা

৮। শারীরিক চাহিদা পূরণ

৯। বসবাসের স্থান

১০। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

১১। ধর্মীয় মূল্যবোধ

১২। স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান

১৩। পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান

১৪। আর্থ-সামাজিক অবস্থা

১৫। যোগাযোগ

১৬। উপজীবিকা

১৭। আবহাওয়া ইত্যাদি

অংশ-খঃ শিশুর বিকাশ এবং আচরণে খাদ্যের উপাদানসমূহের প্রভাব

১। শিশুর বিকাশে এবং আচরণে খাদ্যের উপাদানসমূহের নৈতিবাচক প্রভাব

- শিশুর পরিপূর্ণ মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে না।
- শিশুর বোধশক্তির ঘাটতি দেখা দেয়।
- শিশুর মেধা ও মননের বিকাশ ঘটে না।
- শিশু ধীরে ধীরে মুটিয়ে যায়।
- শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়।
- দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- শিশুর শেখার প্রতি আগ্রহ কমে যায়।
- শিশুর মনে রাখার ক্ষমতা কমে যায়।
- শিশুর স্মরণশক্তি হ্রাস পায়।
- শ্রেণি পাঠে মনোযোগ কমে যায়।
- সহপাঠীদের সাথে মারামারি করতে থাকে।
- পাঠে আগ্রহ এবং আনন্দ দুটোই হারায়।
- বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার হ্রাস পায়।
- শিশুর বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- বদহজম দেখা দেয়।
- ঘুম ভালো হয় না।
- শিশুর রক্তসল্পতা দেখা দেয়।
- শিশুর মাথাধরা এবং অবসাদ সৃষ্টি হয় ইত্যাদি।

২। শিশুর বিকাশে এবং আচরণে খাদ্যের উপাদানসমূহের ইতিবাচক প্রভাব

- শরীরের প্রয়োজনীয় তাপ এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- শরীরের গঠন সঠিকভাবে হয়।

- শিশুর শরীরের বৃদ্ধি এবং ক্ষয়পূরণ যথাযথ হয়।
- শিশু সবল এবং রোগমুক্ত থাকতে পারে।
- শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- শরীরের ত্বক মসৃণ হয়।
- শিশুর ওজন স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায়।
- শিশুর দেহের চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।
- শিশুর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।
- খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে এবং খাদ্য মুখরোচক লাগে।
- শিশুর মেধা ও মননের যথাযথ বিকাশ ঘটে।
- শিশুর দূর্বলতা অনুভব করে না।
- শিশু মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে।
- শিশুর কর্মক্ষমতা ঠিক রাখতে সাহায্য করে।
- শিশু মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পায়।
- শিশুর খিটখিটে মেজাজ দূর হয়।
- শিশুকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।
- শিশুর শারীরিক বিকলাঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- শিশুর মানসিক প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষা করে।
- শিশুর মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।
- শিশুর শেখার আগ্রহ হারায় না।
- শিশুর স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- পাঠে মনোযোগী হয়।
- সহপাঠীর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করে।
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হয়।
- শিক্ষকদের আদেশ মেনে চলে ইত্যাদি।

অংশ-গ: শিশুর বিকাশে খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব এবং শিক্ষকের করণীয়

১। শিশুর বিকাশে খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশীর জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। শিশুর জীবনের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

- ক্ষর্বাকৃতি রোধ: শিশুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মতো সুষম ও পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

- অস্বাস্থকর চর্বি (ফ্যাট) রোধ: শিশুকে স্বাস্থ্যকর খাবার না দিলে শিশুর শরীরে অস্বাস্থ্যকর চর্বি জমা হবে যা শিশুকে মুটিয়ে দিবে। অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট শিশুর ব্রেনের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তাই শিশুকে জাঙ্ক ফুড বা ফাস্ট ফুড না দিয়ে সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সুষম খাদ্যাভ্যাস শিশুর ব্রেনের বিকাশে সহায়তা করে।
- শিশুর বেড়ে উঠা: শিশুর বেড়ে উঠার প্রতি সচেতন থাকলে শিশুর পুষ্টি বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা নির্ণয় করা যায়। কমপক্ষে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুর গ্রোথ চার্টের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নের স্বাভাবিকভাবে হবে।
- শিশুর অসুস্থতা রোধ: শিশুর সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তার দেহ ইনফেকশন ও অসুস্থ্যতা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। সুষম খাদ্যাভ্যাস শিশুর অসুস্থ্যতার প্রবণাতাকে কমাতে পারে।
- শক্তিশালী পরিপাক ব্যবস্থা গড়ে তোলা: শিশুর শক্তিশালী পরিপাক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস তৈরি করতে হবে। পরিপাকতন্ত্রের বিকাশ শিশুর দ্রুত হজম হতে সহায়তা করে। এতে শিশুর ভালো ঘুম হয়।
- মেধার বিকাশ: শিশুর স্বাভাবিক মেধার বিকাশের জন্য চাই সঠিক খাদ্যাভ্যাস।

২। ভেজাল খাদ্যের প্রভাব

বেশি দামি খাদ্যের সাথে কম দামি খাদ্য বা খাবারের অযোগ্য কিছু মিশানোকে ভেজাল খাদ্য বলে। যেমন,

- কাচাঁ মাছ, পাঁকা ফল সতেজ রাখতে ফরমালিন ব্যবহার।
- দুধ, চিনি ইত্যাদিতে সাদাভাব আনতে হাইড্রোজেন।
- অপরিণত ফলমূল পাকাতে কার্বাইড।
- মুড়ি সাদা করার জন্য এবং আকার বড় ও সুন্দর করার জন্য ইউরিয়ার ব্যবহার।
- গুঁড়া মশলার মধ্যে কৃত্রিম রং এবং ইটের গুঁড়া ইত্যাদির ব্যবহার।
- জিলাবি, হোটেলের সিংগারা ইত্যাদি ভাজার জন্য পাম অয়েল, পশুর চর্বির ব্যবহার।
- চিকেনফ্রাই এর জন্য মৃত বা রোগাক্রান্ড় মুরগির ব্যবহার।
- মাখন হিসেবে অপরিশোধিত সস্তা চর্বি।
- শুঁটকী মাছে ডিডিটি।
- ফলের রং উজ্জ্বল করার জন্য অধিক ক্ষার জাতীয় টেক্সটাইল রং এর ব্যবহার।
- আমকে হলুদ রং করার জন্য ইথাইলিন বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড এর ব্যবহার।

শিশুর খাদ্যে ভেজালে ক্ষতিকর প্রভাব:

- মশলায় রং/ইটের গুড়া/কাঠের গুড়া ইত্যাদি মেশানোর ফলে শিশুর শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ডায়ারিয়া, লিভারের ক্ষতি, কিডনীর ক্ষতি হয়।
- তেলে কৃত্রিম রং ও গন্ধ এবং ঝাঁঝ মিশানো কারণে শিশুর স্বাস্থ্যে অনেক ক্ষতি হয়।

- পোড়া তেল বা মবিল ব্যবহারের ফলে শিশুর কিডনী, লিভারে সমস্যা হয় এবং শিশু বিকলাঙ্গ এমনকি মরণব্যাধি হতে পারে।
- দুধে পানি/মেলামাইন মিশানোর জন্য শিশুর পাকস্থলী, কিডনী, স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- আইসক্রিমে মেশানো পাউডার, টিস্যু, লেদার কালার, পোড়া মবিল, রং শিশুর দেহের জন্য অত্যান্ত ক্ষতিকর। এটি শিশুর এলার্জি, বমি, পেটব্যাথ্যা, বদহজম, কিডনী টিউমারের জন্য দায়ী।
- কেক, পাউরুটি, বিস্কুটে পঁচা ডিম, কৃত্রিম রং, পঁচা ময়দা, মেয়াদোত্তীর্ণ দুধ শিশুর পেটের পীড়া, ফুসফুস, লিভার, হৃৎরোগ, এমনকি ক্যান্সারের জন্য দায়ী।
- ফ্রুটজুসের রং, কৃত্রিম গন্ধ, ঘন চিনি ব্যবহারে শিশুর চর্মরোগ, লিভার, কিডনী এবং পেটের পীড়া দেখা দেয়।

  তথ্যসূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। ফাস্ট ফুড খাবার কেন অস্বাস্থ্যকর

- ভাজার কাজে ব্যবহৃত তেল বারবার ব্যবহার করার কারণে তাতে বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয়।
- ব্যবহৃত কাচামাল পুষ্টিমানসম্পন্ন হয় না।
- বেঁচে যাওয়া পঁচা, বাসি উপকরণ বার বার ব্যবহার।
- খাদ্য প্রস্তুত করার স্থান ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব।
- খাদ্য পরিবেশনের সরঞ্জামাদিতে জীবাণুযুক্ত থাকে।
- বদহজ হয়।
- বিভিন্ন ধরণের ক্যামিকেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪। খাদ্যে রং মিশানোর কুফল

- মশলায় রং/ইটের গুড়া/কাঠের গুড়া ইত্যাদি মেশানোর ফলে শিশুর শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ডায়ারিয়া, লিভারের ক্ষতি, কিডনীর ক্ষতি হয়।
- তেলে কৃত্রিম রং ও গন্ধ এবং ঝাঁঝ মিশানো কারণে শিশুর স্বাস্থ্যে অনেক ক্ষতি হয়।
- আইসক্রিমে মেশানো পাউডার, টিস্যু, লেদার কালার, পোড়া মবিল, রং শিশুর দেহের জন্য অত্যান্ড় ক্ষতিকর। এটি শিশুর এলার্জি, বমি, পেটব্যাথ্যা, বদহজম, কিডনী টিউমারের জন্য দায়ী।
- কেক, পাউরুটি, বিস্কুটে পঁচা ডিম, কৃত্রিম রং, পঁচা ময়দা, মেয়াদোত্তীর্ণ দুধ শিশুর পেটের পীড়া, ফুসফুস, লিভার, হৃৎরোগ, এমনকি ক্যান্সারের জন্য দায়ী।
- ফ্রুটজুসের রং, কৃত্রিম গন্ধ, ঘন চিনি ব্যবহারে শিশুর চর্মরোগ, লিভার, কিডনী এবং পেটের পীড়া দেখা দেয়।

৫। খাদ্যাভ্যাস তৈরিতে শিক্ষকের ভূমিকা এবং করণীয়

- শিশুদের খাদ্য সম্পর্কে অবহিত করা।

- শিশুদের সুষম খাবারের সাথে পরিচিত করানো।
- শিশুর অভিভাবকদের খাদ্য ভেজাল সম্পর্কে অবহিত করা।
- বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে ব্যানার বা পোস্টার লাগানো।
- অভিভাবক সভা, মা সভা, উঠান বৈঠক, হোম ভিজিট করার সময় খাদ্যে ভেজাল এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং অবহিত করা।
- খাদ্য সচেতনা নিয়ে বিদ্যালয় পর্যায়ে নাটিকা তৈরি করা।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেয়ালিকা তৈরি করানো।
- বিদ্যালয় পর্যায়ের আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে খাদ্য ভেজাল নিয়ে খবর/নিবন্ধ/প্রবন্ধ উপস্থাপন করা।
- সুষম খাদ্য দিয়ে খাদ্যাভ্যাস তৈরি সপ্তাহ পালন করা ইত্যাদি।

৬। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অপুষ্টিতে ভোগার কারণ ও প্রতিকার

- দারিদ্রতা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা
- পুষ্টি জ্ঞানের অভাব
- নিরক্ষরতা
- খাদ্য ঘাটতি
- চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাস
- ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ
- পরিবারের সদস্যদের মাঝে অসম খাবার বন্টন
- সামাজিক কুসংস্কার
- সামাজিক ত্র"টিপূর্ণ রীতিনীতি
- শিশুর বাড়তি খাবারের বিষয়ে মায়ের অজ্ঞতা
- শিশুর বুকের দুধ না খাওয়ানো
- ঘনঘন সন্তান নেয়া
- পারিবারিক অভ্যাসগত কারণ
- পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে অনীহা
- শিশুর স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য সেবার অপ্র"তলতা
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস
- শৈশবেই বিভিন্ন সংক্রমক রোগে আক্রন্ত হওয়া ইত্যাদি।

অধিবেশন-১৩	শিরোনাম: শিশুর বিকাশ ও শিখনে প্রেষণার গুরুত্ব এবং শিক্ষকের করণীয়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বিকাশে প্রেষণার ধারণা এবং প্রেষণাচক্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর বিকাশ ও শিখনে প্রেষণার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
গ. বিদ্যালয়ে শিশুর প্রেষণা সৃষ্টির কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন;
ঘ. শিশুর আচরণে নিয়ন্ত্রণে প্রেষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিশুর বিকাশ ও শিখনে প্রেষণার গুরুত্ব এবং শিক্ষকের করণীয় — সহায়ক তথ্য-১৩

অংশ-ক: শিশুর বিকাশের প্রষণা এবং প্রেষণা চক্র

প্রেষণা হলো এমন একটি অবস্থা যা আমাদের কোন আচরণে বা কাজে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমূখী করে এবং লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সেদিকে ধাবিত করে রাখে। Crider, Goethals, Kavanaugh I Solomon এর ভাষায়, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন এবং আগ্রহ যা কোন কাজে প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ বা সক্রিয় করে তোলে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাবিত করে তাই প্রেষণা।

প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়ক উপাদান:
আগ্রহ, কৌতুহল, পরিবেশ, উৎকণ্ঠা, জীবনাদর্শ, সাফল্য, আত্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

এই প্রেষণা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমন-

১। **শারীরবৃত্তীয় বা দৈহিক বা জৈবিক প্রেষণা:** ব্যক্তির জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় চাহিদাগুলি থেকে যে প্রেষণার সৃষ্টি হয়, তাকে জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় প্রেষণা বলে। যেমন, ক্ষুদা, তৃষ্ণা, কাম প্রবৃত্তি, মাতৃত্ব ইত্যাদি।

২। **সামাজিক প্রেষণা:** সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে প্রেষণার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাই সামাজিক প্রেষণা। যেমন, প্রভাব, খ্যাতি, কৃতিত্ব, আনুগত্য, মর্যাদা ইত্যাদি।

৩। **পারদর্শিতার প্রেষণা:** কোনো কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করার আকাঙ্ক্ষাকে পারদর্শিতার বা কৃতি অর্জনের প্রেষণা বলে। যেমন, পেশা, চাকুরি, গবেষণা, আবিষ্কার ইত্যাদি।

প্রেষণা চক্র

চিত্র: প্রেষণা চক্র

অংশ-খ: শিশুর বিকাশ ও শিখনে প্রেষণা

শিশুর শিখন অর্জনে এবং তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রাখাতে প্রেষণার গুর"ত্ব অপরিসীম। যেমন,

- এটি শিশুকে শিখন অভিমূখে ধাবিত করে।
- এটি শিশুকে দীর্ঘ সময় শ্রেণি কক্ষে মনোযোগী হতে সহায়তা করে।
- এটি শিশুকে লক্ষ্য-ভিত্তিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।
- এটি শ্রেণি কার্যক্রমে শিশুর কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়।
- এটি শিশুকে কাজের প্রতি যত্নশীল করে তোলে।
- এটি শিশুকে দায়িত্ববান হতে সাহায্য করে।
- এটি শিশুকে নিজস্বতা শিখায়।
- এটি শিশুর আত্মবিশ্বাস যোগাতে সাহায্য করে।
- এটি শিশুর আত্ম-সম্মানবোধ বাড়িয়ে দেয়।
- এটি শিশুর দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।
- এটি শিশুর লক্ষ্য স্থির করতে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- এটি শিশুর আগ্রহ বিকাশ করে।
- এটি শিশুর প্রতিভাকে বিকশিত করে।
- এটি শিশুকে শ্রেণিকক্ষে সক্রিয় করে তোলে।
- এটি শিশুকে চ্যালেঞ্জ নিতে সহায়তা করে।
- এটি শিশুকে অধ্যবসায়ী করে তোলে।
- এটি শিশুকে মানসিক-ভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করে।
- এটি শিশুর কর্মক্ষমতা বাড়ায়।
- এটি শিশুকে ভালো ফলাফলে উদ্বুদ্ধ করে।

- এটি শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হতে উৎসাহ যোগায়।
- এটি শিশুকে সৃজনশীল হতে সহায়তা করে।
- এটি শিশুকে ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করে।

অংশ-গঃ শিশুর প্রষণা সৃষ্টিতে শিক্ষকের করণীয়

প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষকের যেসব বৈশিষ্টা থাকা দরকার,

- শিশুর সম্পর্কে সম্মক ধারণা লাভ করতে হবে।
- শিশুকে প্রলুব্ধ করার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- শিশুর যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
- শিশুর কোন বিষয়ের প্রতি প্রবণতা রয়েছে তা জানতে হবে।
- পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- শিশুকে বুঝতে হবে।

প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষকের করণীয়

প্রেষণা শিশুর শৈশব থেকেই তার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। কোনো শিশু শৈশবেই যদি ইচ্ছা পোষণ করে সে পাইলট হবে। এই ইচ্ছা তাকে লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করবে এবং তার পড়ার প্রতি আগ্রহ আপনি আপনি তৈরি হবে। লক্ষ্য শিশুকে প্রেষণা সৃষ্টি করে সফলতার দিকে ধাবিত করবে। শিশুর মাঝে এই প্রেষণা জাগ্রত করার অন্যতম অনুঘটক। বিদ্যালয়ে শিশুর প্রেষণা জাগ্রত করতে কিছু কৌশল অনুসরণ করতে পারেন। যেমন,

- প্রশংসা: প্রশংসা শিক্ষার্থীদের প্রেষণা হিসেবে কাজ করে।
- পুরস্কার: পুরস্কারের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রেষণা তৈরি করতে পারে। এই পুরস্কার মূর্ত বা বিমূর্ত হতে পারে। পুরস্কার সাংকেতিক ধরণের বা লিখিত বা বস্তু হতে পারে। পুরস্কার প্রেষণাকে স্বয়ংক্রিয় হতে সাহায্য করে। ফলে শিখনও স্বতঃস্ফূর্ত হয়।
- সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা: পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রেষণা সৃষ্টি করে। এতে শিখন স্থায়ী হয়।
- সফলতা: সফলতার অভিজ্ঞতা প্রেষণা সৃষ্টির জন্য সহায়ক। অন্যদিকে, ব্যর্থতার অনুভূতি ব্যক্তির মাঝে হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করে এবং কর্মবিমুখ করে তোলে। তাই সফলতার অভিজ্ঞতা আলোচনা করলে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রেষণা সৃষ্টি হবে যা তাদেরকে ব্যর্থতাকে পরিহার করতে সহায়তা করবে।
- মূল্যায়ন:
- পারদর্শিতার আকাঙ্ক্ষা:
- শিক্ষার্থীর শিখন উপাদানে আগ্রহ প্রদর্শন:
- মনোযোগ সহকারে শুনা:

- উৎসাহ প্রদান:

অংশ-ঘঃ শিশুর আচরণ ও প্রষণা

শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণে প্রষণা

চাহিদাবোধ থেকেই শিশুর আচরণের সৃষ্টি হয়। চাহিদা হলো শিশুর অভাববোধ। আর এই অভাববোধ শিশু মাঝে একধরণের অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করে। এই অস্বস্থিবোধই শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। পরিপূর্ণ আনন্দ সাধন না করতে পারলে শিশু কখনই সুষম ব্যক্তিত্যের অধিকারী হয় না।

শিশুর লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিতে পারলে শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শিশুর প্রেষণা জাগ্রত করা গেলে শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। লক্ষ্য শিশুকে প্রেষণা সৃষ্টি করে সফলতার দিকে ধাবিত করবে।

অধিবেশন-১৪	শিরোনাম: শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যতার কারণে শিশুর বহুমূখী বিকাশ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বহুমুখী বিকাশে শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিশুর উপস্থিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিখন শেখানো কাজে বৈচিত্র্যময় শিশুর অন্তর্ভুক্তরণে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যতার কারণে শিশুর বহুমূখী বিকাশ	সহায়ক তথ্য-১৪

অংশ-ক: শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্রময় শিশু

শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিশু:

ক) পথ-শিশু

সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত পথ-শিশুরা প্রকৃত পক্ষেই ঝুঁকিগ্রস্থ এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত। এসকল শিশুরা নিরাপত্তা, খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপদ পানি ও পয়:নিষ্কাশন, পোশাক, চিকিৎসা সহায়তা এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এ্যারাইজ প্রকল্পে পথ শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'পথ-শিশু হলো সেইসব শিশু যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে তারা রাস্তায় কাজ করে, বসবাস করে ও ঘুমায় এবং তারা মৌলিক অধিকার বঞ্চিত'।

খ) পিছিয়ে পড়া শিশু

যেসব শিশু তার সমবয়সি অন্যান্য শিশুদের মতো শিক্ষালাভ করতে পারে না তাদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শিশু বলে।

গ) চরম দরিদ্রতায় নিমজ্জিত শিশু

যে সব শিশু পারিবারিক দরিদ্রতার কারণে শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না। পরিবারের প্রয়োজনে কর্মে প্রবেশ করে। কাজের জন্য শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হতে পারে না, তারাই চরম দরিদ্রতায় নিমজ্জিত শিশু।

ঘ) শহুরে বস্তিবাসী শিশু

পল্লী অঞ্চল থেকে ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্র জনগণের জীবন জীবিকার কারণে শহরে আগমনের ফলে শহরের বস্তিতে বসবাসরত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের অধিকাংশ বস্তি যথাযথ পয়:নিষ্কাশন ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং এসব বস্তিতে কর্ম ব্যবস্থাপনার কোনো সুযোগ নেই এবং তারা কখনই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। এসব শিশুই শহুরে বস্তিবাসী শিশু।

ঙ) সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রান্তিক শিশু

বিশেষ পেশার লোকজন যেমন বেঁদে, নাপিত এবং সুইপার, মুচি, যৌনকর্মী ইত্যাদি পরিবারের শিশুরাই প্রান্তিক শিশু হিসেবে পরিচিতি।

চ) কর্মজীবী শিশু

কর্মজীবী শিশুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। শিক্ষার নিম্নমান অর্জনকারী অনিয়মিত উপস্থিতি এবং এর সব কিছুই দরিদ্রের সাথে সম্পর্কিত। বিদ্যালয় গমনোপযোগি শিশু অনানুষ্ঠানিক কাজের সাথে জড়িত। এমনকি জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে জাহাজ ভাঙ্গা, যৌনকর্মী, চিংড়ির পোনা সংগ্রহ, মাঠে কাজ করা, কশাইয়ের কাজ, চোরাকারবারী, মাদক বহনকারী এবং রাজনৈতিক সহিংসতায় ব্যবহার। এই শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন না করার অন্যমত কারণ হচ্ছে লেখা পাড়ার খরচ বহন করতে না পারা এবং গৃহস্থালী কাজে অংশগ্রহণ। সরকার এবং এনজিওরা Hard to Reach, ইউসেপ এবং ROSC প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এর মাধ্যমে সব শিশুকে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

ছ) পরিত্যক্ত শিশু

বেশ অনেক শিশু রয়েছে যাদের বাবা মা তাদের পথে ঘাটে ফেলে রেখে চলে গেছে, বা কোন কারণে মা-বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এই সকল শিশুরা পরিত্যক্ত শিশু হিসাবে চিহ্নিত। তারা পথে ঘাটে তাদের জীবন কাটিয়ে দেয়। এই সকল শিশুদের দেখার কোন ব্যবস্থা নাই বলে তাদের পক্ষে জীবন ধারন করা কঠিন, সেক্ষেত্রে লেখাপড়া করার প্রশ্নই ওঠে না।

জ) এতিম শিশু

ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের আর একটি ধরণ হচ্ছে এতিম শিশু। বাংলাদেশে ব্যাপক সংখ্যক এতিম শিশু রয়েছে। এরাও অনেকেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

ঝ) চা বাগানের শিশু

সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মৌলভী বাজারের চা বাগানে বসবাসরত শিশুরা ঝুঁকিগ্রস্থ এবং শিক্ষার অধিকার থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত।

ঞ) পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের লেখাপড়া ও মৌলিক অধিকারের কোন সুযোগ থাকে।

ট) জেল খানার শিশু

অনেক শিশু বিভিন্ন কারণে কারাগারে অন্তরীণ রয়েছে। জেলখানায় আবদ্ধ শিশুরা পড়া-লেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিশুদের জন্য আইনী সহায়তার ব্যবস্থা আমাদের দেশে তেমন একটা নেই। ফলে জেলখানায় অবস্থানরত শিশুদের পড়া-লেখার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশে মাত্র দু'টি কিশোর সংশোধনাগার রয়েছে।

ঠ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশু

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজনেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রোকোণা, ঠাকুরগাঁ, রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বসবাস করে। এসব পরিবারের শিশুরাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশু হিসেবে পরিচিত। এদের অনেকেই শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিশু থাকার উপকারীতাঃ

- **শিশুর জ্ঞানীয় দক্ষতা এবং বিশ্লেষণধর্মী ক্ষমতার বিকাশ**

শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিশুর উপস্থিতি শিশুদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে সাহায্য করে। পরিবার, আত্নীয়স্বজন এবং চেনাগণ্ডির বাইরে নানা ঘটনার সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের নানান অভিজ্ঞতা শিশুদের জ্ঞানীয় বিকাশ ত্বরান্বিত করে এবং বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতার বিকাশ ঘটায়। ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বন্ধু এবং পরিবেশ তাকে উদ্ভূত নানান পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে শেখায়, যেকোনো সমস্যা সমাধানে পারদর্শী হতে সাহায্য করে।

- **বৈচিত্র্য সুনাগরিক তৈরিতে সহায়তা করেঃ**

শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সব শিশুকে তাদের নিয়মমাফিক বা র"টিনবদ্ধ জীবনের বাইরে ভিন্ন ঘটনা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে। নানান ধরণের মানুষের সাথে মেশার সুযোগ প্রত্যেকটি শিশুকে আরো মানবিক এবং সহনশীল হতে শেখায়, দায়িত্ববান হতে সাহায্য করে। আর এসব গুণের সমন্বয় পরিণত বয়সে শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

- **বৈচিত্র্য সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করে**

নতুন এবং স্বতন্ত্র কিছু তৈরি করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং পরিবর্তনের সমন্বয় করাই সৃজনশীলতা। মানুষ যতো বিভিন্ন ঘটনা, অভিজ্ঞতা এবং অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় ততোই তার মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সায়েন্টিফিক আমেরিকার গবেষকদের ফলাফলে দেখা যায়, যেকোনো সমস্যার সমাধান করার কাজে বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বেড়ে উঠা শিশু অনেক বেশি পারদর্শিতা এবন সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়।

- **বৈচিত্র্য পরিণত এবং পরিপক্ব হতে সহায়তা করে**

শিশুরা বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার পর বাস্তব পৃথিবীর কর্মজগতে প্রবেশ করে যেখানে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ও বৈশিষ্ট্যের মানুষের সাথে মিশতে হয়, কাজ করতে হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে ভিন্ন পরিবেশ এবং মানসিকতার মানুষের সাথে মেশা এবং কাজ করা কঠিন। শুর" থেকেই শিশু বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বেড়ে উঠলে সহজেই সকল পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

অংশ-খঃ শিক্ষায় সম্পৃক্ত করণে শিক্ষকের ভূমিকা

- ভাষাগত ও কৃষ্টিগত বৈপরীত্যকে মর্যাদা দেবেন।
- বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করবে।
- বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশুর সকল শিশুর জন্য শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করবে।
- নতুন ভাষা (বাংলা) শিখতে সমস্যা হবে বিধায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের বিশেষ যত্ন নেবেন।
- নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেশি হবে সে জন্য তাদের অতিরিক্ত যত্ন নেবেন।

- শিশুদের বিকাশ, সুরক্ষা এবং অধিকার নিয়ে মা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক, অভিভাবক সমাবেশ, এসএমসি, হোম ভিজিট ইত্যাদিতে সবাইকে অবহিত করবেন।
- বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অন্য শিশুদের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মূল্যবোধ তৈরি এবং রক্ষায় সাহায্য করবেন।
- কোনো সমস্যার সমাধান করতে না পারলে সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করবেন।
- অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করে তাদের সাথে কথা বলবেন এবং সহযোগিতা নেবেন।
- সমাজ, এসএমসি, পিটিএ এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধ করবেন, যেন তারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে পারেন। এভাবে সুবিধা বঞ্চিত সকল শিশুদের সমস্যা লাঘব করার চেষ্টা করবেন।
- প্রয়োজনে সেই সমাজ থেকে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক সহায়ক হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- শিশু জরিপের সময় সুবিধা বঞ্চিত সকল শিশুদের ঠিকমত জরিপে অন্তর্ভূক্ত করবেন এবং তাদের ভর্তি নিশ্চিত করবেন।
- উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী মনোনয়নের সময় সুবিধা বঞ্চিত সকল শিশু থাকলে শর্ত সাপেক্ষে তাদের বিষয়টি বিবেচনা করবেন। তাছাড়া তাদের চাহিদা এবং সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনা করে উপবৃত্তির জন্য তাদের অগ্রাধীকার দেয়া।

অধিবেশন-১৫	শিরোনাম: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর পরিচয় এবং তাদের শিখন চ্যালেঞ্জ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বিশেষ শিক্ষার্থীর শিখন চ্যালেঞ্জসমূহ শনাক্তকরণ এবং সমাধানের পর্যায় চিহ্নিত করতে পারবেন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর পরিচয় এবং তাদের শিখন চ্যালেঞ্জ — সহায়ক তথ্য- ১৫

অংশ-ক: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর পরিচয়

প্রতিবন্ধী শিশু

শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত ঘাটতি থাকলে তার পক্ষে যে কোনো কাজ স্বাভাবিকভাবে করতে অসুবিধা হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে এই ঘাটতি এতটা গুরুতর যে সহায়ক উপকরণ ও অন্যের সাহায্য নিয়েও চলাচলে ও লেখাপড়ায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। যেসব শিশুর অঙ্গহানি, শ্রবণে প্রতিবন্ধকতা, দর্শনে প্রতিবন্ধকতা, আবেগীয় নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি, কম বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য থাকলে সেসব শিশুকে প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয়।

ওয়ার্কশীট-১

কেস নং	চরিত্রের নাম	চ্যালেঞ্জের প্রকৃতি	প্রতিবন্ধিতার ধরন
১	রিফাত	হাত পায়ের স্বাভাবিক নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। হুইলচেয়ারে ভর করে চলাফেরা করে।	শারীরিক প্রতিবন্ধী (physical disability)
২	রাইমা	ব্লাকবোর্ডের লেখা এবং পাঠ্যবই এর ছোট ছোট লেখা ভালভাবে না দেখার কারণে পড়তে পারত না।	দৃষ্টিগত চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু (Visual Problems/disability/impairment)

৩	কামরান	আগ্রাসী বা উদ্বিগ্ন আচরণ করে। অন্যের আদেশ পালনে অপারগতা প্রকাশ করে।	গুরুতর ব্যবহারগত/আবেগিক চ্যালেঞ্জ (Severe Behavioural/Emotional Problem/disability)
৪	আরিফা	বুদ্ধিমত্তার বিকাশটা অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের থেকে ধীরগতি সম্পন্ন এবং তার মানসিক ও অন্যান্য বিকাশও কিছুটা বিলম্বিত। সে তার চেয়ে কম বয়সী শিশুদের মত আচরণ করে।	বুদ্ধিগত চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিশু (Intellectual Problems/disability)
৫	রাতুল	কানে কম শুনত।	শ্রবণগত চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিশু (Hearing Problems/disability/impairment)
৬	ঔীমা	কথা বলায় জড়তা (তোতলামি) ছিল। ফলে তার উচ্চারণ ও ভাষা বুঝতে অন্যদের একটু সমস্যা হতো।	যোগাযোগ চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিশু (Communication Problems/disability)

ক) শারীরিক চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু (Physical Challenges/disability):

শিশুর অঙ্গহানী বা শারীরিক এমন **সমস্যা** যা অন্যের সাহায্য নিয়ে ছাড়া চলাচল করতে পারেনা; এমনকি সমস্যা এতটা গুরুতর যে সহায়ক উপকরণ ও অন্যের সাহায্য নিয়েও চলাচলে ও লেখাপড়ায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। কিছু কিছু শিশু হুইলচেয়ার, ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং অন্যের সাহয্যে লেখাপড়া বা চলাচল করতে পারে। শরীরের কোনো কোনো সম্ভাবনা রয়েছে বা কোনো কোনো অঙ্গ বেশি বা ভালোমত কাজ করতে পারে তার দিকে বেশি নজর দিতে হবে। সেগুলোকে বেশি করে কাজে লাগাতে হবে। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করতে পারার জন্য প্রয়োজনে হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, সাদা ছড়ি, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়া দরকার।

শ্রেণিকক্ষে শিখনে বাধা-

১। লিখতে সমস্যা হয়। কেননা অনেকেই হাতের পরিবর্তে পা ব্যবহার করে।

২। শ্রেণিতে ব্যবহারিক কাজে সমস্যা হয়।

খ) দৃষ্টিগত চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু (Visual Problems/disability/impairment):

আসন বিন্যাসের কারণে এ ধরণের শিশুদের দেখতে বা পড়তে আরও সমস্যা হয়। আবার কেউ কেউ চশমা ছাড়া দেখতে পারে না। এদের সহায়ক উপকরণ যেমন: চশমা, আতশী কাঁচ, বড় লেখার বা ছাপার অক্ষরের বই, মোটা দাগের কলম,

আসন পুনর্বিন্যাসের ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কিছু কিছু শিশুর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চশমার সাহায্যের পরও কাছের/দুরের লেখা বা কিছু দেখতে বা পড়তে সমস্যা হয়। অল্প সংখ্যক শিশু আছে যারা একেবারেই দেখতে পারে না। এদের সহায়ক শিক্ষা পদ্ধতি যেমন: ব্রেইল পদ্ধতি প্রয়োজন হয়। যারা দেখতে পায় না তাদের জন্য ট্যাকটাইল গ্রাফ, টকিং ক্যালকুলেটর, টকিং সফটওয়ার, বাস্তব বা অর্ধবাস্তব উপকরণ ইত্যাদি বেশ সহায়ক হতে পারে। যাদের দেখার সমস্যা রয়েছে তাদের চোখ পরীক্ষা করে চশমা প্রদান করা দরকার।

পাঠ্যপুস্তকে যে সকল ছবি দেয়া হয়েছে তা আরও স্পষ্ট, গাঢ় ও উজ্জ্বল রংয়ের হওয়া প্রয়োজন। স্বল্পমাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাসহ সকলের জন্য তা প্রয়োজন। এছাড়া ছবি দৃষ্টি নন্দন না হলে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূল ধারণাও আসতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। কোনো একটি ছবিতে অসংখ্য বিষয় ও উপ-বিষয় না রাখা উত্তম।

গ) ব্যবহারগত/আবেগিক চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিশু (Behavioural/Emotional Problem/disability):

গ-১) মৃদু ব্যবহারগত/আবেগিক চ্যালেঞ্জ (Mild Behavioural/Emotional Problem): এ ধরণের শিশুরা প্রায়ই আগ্রাসী বা উদ্বিগ্ন আচরণ করে। এরা সাধারণত অন্যের আদেশ অনুসরণ করতে পারে না বা চায় না। তাদেরকে অন্যান্য শিশুদের বা শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।

গ-২) গুরুতর ব্যবহারগত/আবেগিক চ্যালেঞ্জ (Severe Behavioural/Emotional Problem/disability): এ ধরণের শিশু আগ্রাসী বা উদ্বিগ্ন আচরণ করে। প্রায় সময় শব্দ করা, হাত-পা নাড়তে থাকা, অনিচ্ছাকৃত ভাবে নিজের বা অন্যের শারীরিক ক্ষতি করার চেষ্টা করা। অন্যান্য শিশুদের বা শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে বেশ কষ্ট হয়, তবে অনেক শিশুই স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ও মেধাবী হয়। এ শিশুদের আচরণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে এ ধরণের আবেগিক চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। এদের সাথে খুব বেশি বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ধৈর্য্য সহকারে এদের শিখানোর চেষ্টা করতে পারলে নিম্নের ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য দেখে শিখন সমস্যাসম্পন্ন শিশুদের চিনতে পারা যায় :

গ-২.১) ব্যক্তিগত/সামাজিক বিকাশ (Personal/Social Development):

- অন্য শিশুর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়;
- দুর্বল শরীর এবং অবয়ব;
- অপরিপক্ক সামাজিক আচরণ;
- ব্যর্থ হবার ভয়।

গ-২.২) জ্ঞানীয় বিকাশ (Cognitive Development):

- জ্ঞানীয় বিকাশে ধীর বা ঘাটতি;
- জ্ঞানীয় পরিপক্কতা এবং কৃতিত্বে ব্যাপক ব্যবধান।

গ-২.৩) ভাষার বিকাশ (Language Development):

- কোনো কিছু বোঝার জন্য একই জিনিস/ নির্দেশনার পুনরাবৃত্তি;
- স্বাভাবিক শিক্ষার্থীরা দুই বা ততোধিকবার বোঝালে যা বুঝতে পারে, তা তারা পারে না;
- পঠনের ক্ষেত্রে কোনো শব্দ বা লাইনকে বাদ দিয়ে পড়া;
- অর্থ না বুঝে বার বার পুনরাবৃত্তি বা মুখস্ত করা;

- বানানে ভূল বা পারেই না;
- কোনো কিছু দেখে লিখতেও সমস্যা।

গ-২.৪) চলাচল বা গতীয় বিকাশ (Motor Development):

- শিশু অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে একই জিনিসের বারবার পুনরাবৃত্তি করে;
- শ্রেণিকক্ষে অতি সক্রিয়শীলতা;
- স্থুল কাজ (দৌড়ানো, দড়ি লাফ ইত্যাদি) বা সূক্ষ্ম কাজ (সুইয়ে সুতা পরানো) বা উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা;
- বাম থেকে ডান, সামনে থেকে পেছনে পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষমতা।

গ-২.৫) প্রত্যক্ষণমূলক বিকাশ (Perceptual Development):

- দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষণমূলক সমস্যা;
- শ্রবণগত প্রত্যক্ষণমূলক সমস্যা;
- স্পর্শকাতর অর্থাৎ সংস্পর্শ অপছন্দ;
- প্রত্যক্ষণমূলক গতি সমন্বয় সমস্যা।

ঘ) বুদ্ধিগত চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিশু (Intellectual Problems/disability):

এ ধরণের শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক বিকাশ অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুদের থেকে একটু ধীরগতি সম্পন্ন। এদেরকে সামান্য সহায়তার মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাগ্রহণ ও শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব। শারীরিক অপেক্ষা মানসিক বয়স কম হওয়ায় শিশু তার বয়সের চেয়ে কমবয়সী শিশুর মত আচরণ করে। শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতা এদের শ্রেণীকক্ষের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।অন্যদিকে কিছু সংখ্যক শিশু আছে যাদের বুদ্ধিমত্তার ও মানসিক বিকাশ বেশ চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন। এসকল শিশুর সাধারণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা লাভে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকদের পক্ষেও এ ধরনের দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব।

ঙ) শ্রবণগত চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিশু (Hearing Problems/disability/impairment):

এ ধরণের শিশুর সামান্য শ্রবণ সমস্যার কারণে কথা শুনতে/বলতে/বুঝতে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। কিছু কিছু শিশু একেবারেই শুনতে পারে না। এদেরকে ইশারা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় একটু উচ্চস্বরে কথা বলে বা আসন ব্যবস্থার সমন্বয় করলে তারা সহজেই লেখাপড়া করতে পারে। অনেক শিশু শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহার করে শুনতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু স্বল্প মাত্রার অর্থাৎ ৪৫-৬৫dB শ্রবণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। অনেক শিশু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যেও শুনতে পারে না।এদের জন্য উচ্চস্বরে কথা বলা, দৃষ্টিগত উদ্দীপনা, ঠোঁট নাড়াচাড়া ও মুখভঙ্গির ব্যবহার, ইশারা ভাষা ও কথন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভাব বিনিময় নিশ্চিত করা যায়।

যাদের শোনার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে তাদের কান পরীক্ষা করে প্রয়োজনে শ্রবণ যন্ত্র প্রদান করতে হবে যেন তারা শুনতে পায় এবং ভালো করে কথা বলতে পায়। স্পষ্ট উচ্চারণে উচ্চ স্বরে পড়ালে/বললে যাদের শোনার সমস্যা রয়েছে তাদের

জন্য বেশ সহায়ক হবে। উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশলের পরিবর্তন করতে হবে যেন সব কৌশলগুলি মিলিতভাবে সকলের জন্য সমানভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আলাদা আলাদা পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চ) যোগাযোগ চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিশু (Communication Problems/disability):

এ ধরণের শিশুরা সামান্য তোতলা। এদের উচ্চারণে এবং ভাষা বুঝতে সামান্য সমস্যা হয়। তবে এরা প্রায়ই স্বাভাবিকভাবে যোযাযোগ করতে পারে। কিছু কিছু শিশু অধিক তোতলানো, জড়তা, উচ্চারণে এবং ভাষা বুঝতে সমস্যা হওয়ার কারণে বিকল্প পদ্ধতিতে ভাব বিনিময় করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে ইশারার ভাষা, অঙ্গ-ভঙ্গী এবং লেখার মাধ্যমে যোগাযোগ বা ভাব বিনিময় করতে পারে।

ছ) শিখন চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন শিশু (Learning Problems/disability):

এ ধরণের শিশু মৌখিক ভাষা ব্যবহারে, লিখতে, বুঝতে, উপলব্ধিতে, শ্রবণে অথবা গাণিতিক হিসাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। কিছু কিছু শিশুর শিখনে বেশ চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন: বানান ভুল করা, পঠনের সময় পুরো লাইন বাদ দিয়ে পড়া, কথার অর্থ না বুঝে বার বার পুনরাবৃত্তি বা মুখস্থ করার চেষ্টা, শ্রেণীকক্ষে অতি সক্রিয়শীলতা, উল্টা লেখা ইত্যাদি। বিশেষ শিখন কৌশল ও যত্ন নিলে এ ধরণের চ্যালেঞ্জ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। এই ধরনের শিশুদের প্রথম প্রথম হাত ধরে লিখা শিখানোর কাজ করলে, লিখার জন্য ফ্রেম ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মাটিতে গভীর দাগ কেটেও লেখানো যেতে পারে।

নির্দিষ্ট শিখন সমস্যার প্রকারভেদ:

এ ধরনের সমস্যা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। প্রচলিত কয়েকটি রূপ নিচে উল্লেখিত হলোঃ

- এ্যাফাসিয়া (Aphasia): ভাষা, কথা বলা, লিখন এমনকি ইশারার মাধ্যমে যোগাযোগ করার সমস্যা।
- ডিসলেক্সিয়া (Dyslexia): পঠনের সমস্যা, অক্ষর উল্টাপাল্টা দেখা।
- ডিসগ্রাফিয়া (Dysgraphia): লেখার সমস্যা, লিখতে গিয়ে রেখা ঠিকমত দিতে না পারা।
- ডিসারথিরিয়া (Dysarthria): কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যার কারণে স্পষ্টভাবে শব্দ উচ্চারণে সমস্যা।
- ডিসক্যালকুলিয়া (Dyscalculia): গাণিতিক হিসাব করার (যুক্তি নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে) সমস্যা।
- ডিসইনহিবিশন (Dysinhibition):পরিবেশের সকল উদ্দীপক এবং প্রত্যক্ষণে সমস্যা ফলে অতিচঞ্চলতা, বিক্ষিপ্তচিত্ততা এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অমনোযোগিতা।
- ডিসওরিয়েন্টেশন (Dysorientation): সময় এবং অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের সমস্যা।

জ) ভিন্ন ভাষাভাষীদের জন্য চ্যালেঞ্জ (Language Problems/disability)

বিভিন্ন ভাষাভাষী সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্বিক গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মুলস্রোতধারার শিক্ষায় সম্পৃক্ত করা একটি কঠিন কাজ। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা ও কৃষ্টিগত সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ ধরনের বাড়তি যত্ন নেয়া প্রয়োজন। একীভুত শিক্ষার সফলতার জন্য আমাদের সে বিষয়টিকেও মাথায় রাখতে হবে। সেভাবে প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষকদেরও সে বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। প্রয়োজনে প্রাক-প্রাথমিক, ১ম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি ও তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ট্রানজিশন সময় বিবেচনা করে সেভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। দৈত ভাষায় বই রচনা করা এবং পড়ানো একটি সহজ উপায়। শিক্ষক ও সহপাঠিদের বন্ধুত্বসুলভ আচরণ অনেক বেশি সহায়ক হতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর ৩ ধারায় প্রতিবন্ধিতার ধরন সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত, ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্থতা এবং প্রতিকুলতার ভিন্নতা বিবেচনায় প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা-

(ক) অটিজম (autism)

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী (physical disability)

(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability)

(ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (visual disability)

(ঙ) বাক প্রতিবন্ধিতা (speech disability)

(চ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (intellectual disability)

(ছ) শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (hearing disability)

(জ) শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (deaf-blindness)

(ঝ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy)

(ঞ) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disbility)

(ট) ডাউন সিনড্রোম

(ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability)

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার

কিছু শিশু নিজের জগতে ডুবে থাকতে পছন্দ করে। অন্যের সাথে মেশা এমনকি কথা বলতে আগ্রহী হয় না। অনেকে আবার কথা বলতে শেখে না, ডাকলে সাড়া দেয় না, চোখে-চোখে তাকায় না। অনেক ক্ষেত্রে এসব শিশু একই র"টিন অনুসরণ করতে অভ্যস্ড় হয়ে পড়ে, কোনো একটি আচরণ একটানা একঘেয়েমিমূলকভাবে করতে থাকে। যোগাযোগ, সামাজিকতা ও আচরণে মৃদু থেকে গ্রর"তর মাত্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকলে সেসব শিশুকে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু সংক্ষেপে অটিজম বলে। এই ধরণের শিশুদেও ৪০% এর বুদ্ধিমত্তা থাকে স্বাভাবিকের থেকে কম, আবার অনেকের স্বাভাবিক ও কিছু কিছু শিশু অতি মেধাবী হয়। মস্ড়িষ্কেও বিকাশজনিত জটিল অবস্থার কারনে শিশুর জন্মের দেড় থেকে তিন বছরের মধ্যে এধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব শিশুরা বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। যেমন, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, গাণিতিক সমাধান ইত্যাদি (নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩)

বাক প্রতিবন্ধী (speech disability)

যেসব শিশুর কথা বলতে বা স্পষ্ট করে কথা বলতে অসুবিধা হয় তাদের বাক প্রতিবন্ধী শিশু বলে। এরা গুছিয়ে শব্দ ও বাক্য বলা, উচ্চারণে, শব্দের সঠিক ব্যবহারে, একজনের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলতে, গুছিয়ে মনের ভাব প্রকাশে ও অন্যের সাথে অর্থবহ যোগাযোগ করতে সমস্যায় পড়তে পারে। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না পেলে এসকল শিশুর শ্রবণ প্রতিবন্ধীতাও দেখা দিতে পারে। যোগাযোগ করতে পারে না বলে শ্রেণিকক্ষেও এসব শিশুরা পিছিয়ে পড়তে পারে। তবে সঠিক সময়ে চিকিৎসা, শিক্ষাক্রমে ও নির্দেশনা পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা প্রভৃতি কৌশলের মাধ্যমে এদের শিখন উপযোগী পরিবেশ দেওয়া যায়।

শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধতা

কোনো শিশুর মাধ্যে একই সঙ্গে শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির আংশিক বা পূর্ণ সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকলে এবং এর ফলে ঐ ব্যক্তির যোগাযোগ, বিকাশ এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার সন্মুখীন হলে তাকে শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শিশু বলে। শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার মাত্রা অনুযায়ী শ্রবণ-দৃষ্টি চার ধরণের: ১। মাঝারি থেকে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ এবং গুরুতর মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, ২। মাঝারি থেকে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ এবং গুরুতর মাত্রার দৃষ্টি ও সাথে অন্য প্রতিবন্ধিতা, ৩। দৃষ্টি এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়গত প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা, ৪। দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তির ক্রমানবতি (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩)

সেরিব্রাল পালসি

অপরিনট মস্তিষ্কেও কোনো আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোন শিশুর সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা যা তার দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে তাকে সেরিব্রাল পালসি শিশু বলে। এধরণের ব্যক্তির মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ পরবর্তীতে হ্রাস বা বৃদ্ধি না হয় এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। সেরিব্রাল পালসিতে শিশুর এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা এক পাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত বা পা আক্রান্ত হয়ে পারে। পেশী খুব শক্ত বা শিথিল থাকা, হাত বা পায়ের সাধারণ নাড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা, বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা এবং আচরগত ও যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্য (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩)

ডাউন সিনড্রোম

কোন শিশুর মধ্যে বংশানুগতিক কোন বিশেষ অবস্থা যা তার ২১তম ক্রমোসোম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রমোসোম উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যার মধ্যে মৃদু হতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়েড মুখাকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাকে ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলা হয় (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩)।

অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা

কোন শিশুর মধ্যে যদি ধারা উলেখখিত প্রতিবন্ধিতা ব্যতীত এইরূপ অন্য কোন অস্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বিদামান থাকে যা তার স্বাভাবিক জীবন-যাপন, বিকাশ ও চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে, তা হলে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করলে উক্ত শিশুও, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবন্ধী শিশু বলে বিবেচিত হবে (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩)।

প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আইন

১। শিশু আইন, ২০১৩: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1119.html

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1126.html

৩। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯: http://nddtrust.gov.bd/site/view/law/

৪। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা-২০১৫: http://nddtrust.gov.bd/site/view/law/

৫। নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩: http://nddtrust.gov.bd/site/view/law/

অংশ-খ: শিশুর শিখন চ্যালেঞ্জ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়:

- গুছিয়ে কাজ করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়
- একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি সংক্রান্ড় চ্যালেঞ্জ
- মৌখিক উপায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষাগত চ্যালেঞ্জ
- খেলাধুলায় সমবয়সীদের সাথে মিশতে অনাগ্রহ প্রকাশ করা
- প্রত্যাশিত সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভিন্নতা/ চ্যালেঞ্জ
- বয়স উপযোগী দৈনন্দিন জীবন দক্ষতা অর্জনে চ্যালেঞ্জ (যেমন, নিজে নিজে টয়লেট ব্যবহার)
- পেশিগত বিকাশে চ্যালেঞ্জ (যেমন, হাঁটা, দৌঁড়ানো)
- আবেগ প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- মনোযোগ ধরে রাখতে চ্যালেঞ্জ
- তুলনামূলক জটিল বিষয়গুলোর প্রতি নিবিড় মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- শ্রবণে চ্যালেঞ্জ থাকায় পাঠে অমনোযোগী
- মৌখিক/লিখিত/ইশারা ইত্যাদি অনুসরণে চ্যালেঞ্জ
- বাড়িতে, বিদ্যালয়ে বা সামাজিক পরিসরে হাইপার এক্টিভ
- দীর্ঘ সময়ের জন্য এক জায়গায় না বসতে চাওয়া/ছোটাছুটি
- বয়স অনুযায়ী বিকাশের মাইলফলক অর্জনে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগে
- সহপাঠির সাথে সংগতিপূর্ণ উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- ভাষাগত বিকাশে চ্যালেঞ্জ
- শব্দ তৈরি ও উচ্চারণ করতে চ্যালেঞ্জ
- পেছন থেকে আসা শব্দ শোনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- তোতলামভাবে কথা বলায় চ্যালেঞ্জ
- প্রয়োজনীয় শব্দ সাজিয়ে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলায় চ্যালেঞ্জ
- শিক্ষা উপকরণ ধরতে চ্যালেঞ্জ
- হাতে-কলমে কাজ করতে চ্যালেঞ্জ
- শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি।

ওয়ার্কশীট-২

শ্রেণিকক্ষে শিশুর শিখন চ্যালেঞ্জ	কোন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জটি সমাধানযোগ্য
হাতে-কলমে কাজের সুযোগ, দলগত কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ, মতামত প্রকাশের সুযোগ ইত্যাদি	১। বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ২। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ৩। জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য
আসন ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থী ধারণক্ষমতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পারিক অবস্থান, আলো-বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ইত্যাদি	১। বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ২। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ৩। জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য
শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার	১। বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ২। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ৩। জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য
শিক্ষার্থীর আর্থিক চ্যালেঞ্জ, শিক্ষকের দক্ষতার ঘাটতি ইত্যাদি	
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে অধিক সময় দিতে না পারা	
প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণের কার্যকর ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ	
কার্যকর যোগাযোগ ও ভাববিনিময়ের কৌশলের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ	

ওয়ার্কশীট-৩

শিশুর শ্রেণিকক্ষ বহির্ভূত শিখন চ্যালেঞ্জ	কোন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জটি সমাধানযোগ্য
বিদ্যালয়ের ভৌত-অবকাঠামো	১। বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ২। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ৩। জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ
শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস ও অবকাঠামো	১। বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ২। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ৩। জাতীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ৪। আপাতত সমাধানযোগ্য

	না
বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা	১। বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য, ২। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন পর্যায়ে সমাধানযোগ্য
শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকের মধ্যে সম্পর্ক ও সমন্বয়ের অভাব	
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ	
কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ	
বিশেষচাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিক্ষা নিয়ে ভুল ধারণা	

অধিবেশন-১৬	শিরোনাম: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর আচরণ ব্যবস্থাপনা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ ও কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. শিশুর শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ নিরসনে বিভিন্ন কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর আচরণ ব্যবস্থাপনা	সহায়ক তথ্য-১৬

অংশ-ক: প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ ও আচরণের কারণ

শিক্ষার্থীর কোন ধরণের আচরণকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়:

- যে আচরণ তার নিজের এবং অন্য শিক্ষার্থীদের শিখনে বাধা দেয়।
- যে আচরণ শিক্ষার্থীর নিজের এবং অন্য সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য ক্ষতিকর।
- যে আচরণ বিদ্যালয়/শ্রেণি কক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দেয়।
- যে আচরণ এর তীব্রতা, ধারাবাহিকতা এবং সময়কাল শ্রেণিকক্ষের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।
- যে আচরণ বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষের নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে বাধা প্রদান করে।

শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ:

- পাঠে মনোযোগ না দেয়া।
- শ্রেণিকক্ষে অন্যান্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের এড়িয়ে চলে।
- আত্মকেন্দ্রকতা বা নিজেকে আবদ্ধ রাখে।
- অন্যকে আঘাত করা।

- জেদ করা।
- অতিরিক্ত কান্নাকাটি করা।
- অসংগত বা অগ্রহণযোগ্য ভাষার ব্যবহার।
- ধাক্কা, খোঁচা, লাথি, কামড়, আঁচড়, খামচি ইত্যাদি।
- একে অন্যকে হুমকি দেয়া।
- শ্রেণি কক্ষের পরিবেশ বা সম্পদের ক্ষতি করা।
- শ্রেণি নির্দেশনা অনুসরণ না করা।
- নিজের সিট থেকে বারবার উঠে যাওয়া।
- পাঠের সময় আলোচ্য বিষয়ের বাইরে বারবার অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা।
- বিদ্যালয়ের এসেম্বলির সময় অসংলগ্ন আচরণ করা।

প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ কেন করে-

- শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব
- শিশুর আবেগ প্রকাশের নিরাপদ পরিবেশ না থাকা
- শিক্ষার্থীর অন্যের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- শিক্ষার্থীর নিজের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব
- শিক্ষক ও সহপাঠীর প্রত্যাশা বুঝতে না পারা
- শিক্ষার্থীর কাছে কী ধরণের আচরণ প্রত্যাশা করে তা না বুঝা
- শিক্ষার্থীকে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে না জানানো
- শিক্ষার্থীকে নিজের চাহিদা এবং অনুভূতি বোঝাতে না পারা
- শিক্ষার্থীর নিজের চাহিদা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে না শেখানো
- শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা অনুযায়ী শিখন পরিবেশ না থাকা
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা কার্যকর না হওয়া
- শিক্ষকের নির্দেশনা প্রদানে অস্পষ্টতা
- শিখন কার্যক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী মাল্টি সেনসরি শিক্ষা উপকরণ না থাকা
- শিক্ষার্থীর উপযোগী শিখন প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি
- শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষক ও সহপাঠীদের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক ডিভাইস না থাকা
- বহুমূখী ভাব বিনিময়ের কৌশল ব্যবহার না করা
- শিক্ষার্থীর উপযোগী ও নিরাপদ পরিবেশের অভাব
- বুলিংয়ের শিকার হওয়া

- শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার জন্য উপযুক্ত উৎসাহ/প্রেষণা/প্রেরণা/রিইনফোর্সমেন্ট না থাকা
- শিক্ষার্থীর অনাকাঙ্খিত আচরণ ও কাজ ঘটার সাথে সাথেই শিক্ষক তাতে মনোযোগ দেন
- অপ্রত্যাশিত আচরণ করা মাত্রই তাকে সেটা করতে নিষেধ করা
- শিক্ষার্থীর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিকে নেতিবাচক হিসেবে দেখা
- পরিবার ও বিদ্যালয়ে আবেগ প্রকাশের নিরাপদ পরিবেশ না থাকা ইত্যাদি।

একাধিক আচরণের মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবেঃ

- যে আচরণটি শ্রেণিকক্ষে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীরা করে।
- যে আচরণটি অন্য শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আচরণ করতে উৎসাহিত করে।
- যে আচরণের ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর নিজের বা অন্যদের শিখন বাধাগ্রস্ত হয়।
- যে আচরণ অন্য শিক্ষার্থীর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

অংশ-খঃ প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ নিরসনের কৌশল

ওয়ার্কশীট-১

শিক্ষার্থীর এমন আচরণের পূর্বাবস্থা	আচরণ	ফলাফল	আচরণের উদ্দেশ্য	এমন আচরণ নিরসনে সম্ভাব্য কৌশল
কেস-১ * নাসির কোনায় বসে জোরে জোরে শরীর দোলানো * শিক্ষক থামার জন্য বলে	চিৎকার করা	শিক্ষকের চলে যাওয়া	শারীরবৃত্তীয় অনুভূতি	টেবিলে নিচে সম্ভাব্য উত্তর দেয়া আছে
কেস-২ * ছবিতে রং করতে বলা	ছবিটি ছিঁড়ে ফেলা	* রং লাগবে না- শিক্ষকের এ কথা বলা * সে চুপচাপ সেটে বসে থাকে	এড়ানোর প্রবণতা	
কেস-৩	* ক্লাসের ভিতর	* শিক্ষক সিটে	* শিক্ষক ও	

* ইংরেজি ক্লাস * ক্লাসের শুর"তেই সে সিট থেকে বারবার উঠতে না বলা	ঘুরে বেড়ায় * সিট থেকে বারবার উঠে যাওয়া	বসতে বলেন * সহপাঠীরা তার কর্মকান্ডের প্রতি মনোযোগ দেওয়া * শিক্ষকের চিৎকার করা * তাকে বাহিরে পাঠিয়ে দেওয়া	সহপাঠীদের মনোযোগ আর্কষণ * শ্রেণি কার্যক্রম এড়ানোর প্রবণতা	
কেস-৪ * বাংলা ক্লাস * তার ক্ষুদা লাগা	* ক্লাসে টিফিন খাওয়া * অন্যদের টিফিন খাওয়ার চেষ্টা করা	* শিক্ষকের চিৎকার করা * অন্য সহপাঠিরা বিশৃঙ্খলা তৈরি করা	* শ্রেণি কাজ এড়ানোর প্রবণতা * কিছু (টিফিন) পাওয়া	
কেস-৫ * শিক্ষক পড়ানোর সময় তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা এবং বেশি সময় লাগা * অন্য কোনো সহপাঠীর উত্তর দেওয়া	* ক্ষিপ্ত হয়ে সহপাঠীর দিকে ছুটে যাওয়া * মাঝে মধ্যে মারামারি করা	* শিক্ষকের বকাঝকা করা * উত্তর দিতে বেশি সময় নেওয়ার জন্য নেতিবাচক করা বলা * কান্না করা * স্কুলে আসা কমানো	* শ্রেণি কার্যক্রম এড়ানোর প্রবণতা * অবস্তুগত কিছু পাওয়া (মারামারি করা, ক্লাসের বাহিরে যাওয়া)	

শনাক্তকৃত আচরণগত চ্যালেঞ্জ নিরসনে সম্ভাব্য কৌশল (ওয়ার্কশীটের আচরণ)

- শিখনে বাধা তৈরি করে এমন আচরণ করার আগেই আচরণটির কথা না মনে করিয়ে দেওয়া।
- ক্লাসের শুরুতেই প্রত্যাশিত আচরণ বা নিয়ম কি কি তা ছবির মাধ্যমে দেখানো ও মুখে বলা।
- শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট অপ্রত্যাশিত আচরণ (ক্লাসে ঘুরে বেড়ানো, টিফিন আগে খাওয়া ইত্যাদি) এড়িয়ে চলা। একই সঙ্গে অন্য যেসব শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত আচরণ করছে তাদের আচরণটি প্রশংসাসহকারে বলা যেন অন্য শিক্ষার্থীরা শুনতে পায় কিংবা যেকোনো উপায়ে ভালো আচরণগুলোকে উৎসাহিত করা।

- শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরে বা ধমক দিয়ে নির্দেশনা না দেওয়া। নিজে শান্ড় থেকে ও দৃঢ় গলায় নির্দেশ দেওয়া।
- প্রত্যাশিত আচরণের কথা নিজে শান্ড় থেকে ও দৃঢ় গলায় মনে করিয়ে দেওয়া এবং শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাওয়া তার ওই মুহূর্তে কী করা দরকার। যেমন, সিটের বাহিরে ঘুরে বেড়ানো শিক্ষার্থীকে সিটে বসে থাকার ছবি দেখানো এবং জিজ্ঞেস করা তার এখন কী করার কথা। এমনভাবে নির্দেশনা দেওয়া বা এমন কাজ করানো যাতে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত আচরণের দিকে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়। যেমন, ঘুরে বেড়ানো শিক্ষার্থীকে কোনো উপকরণ শিক্ষকের কাছে নিয়ে আসতে বলা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করানো।
- শ্রেণিকক্ষে সবাইকে মেনে চলতে হবে-এমন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা। কেউ নিয়ম ভাঙ্গার মতো কাজ করলে নিয়মটির কথা মনে করিয়ে দেওয়া। মনে করিয়ে দেওয়ার সময় শুধু অপ্রত্যাশিত আচরণ করতে থাকা শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য কওে নয়; বরং সব শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে নিয়ম বলা।
- এমন কোনো সুযোগ বা কাজ না দেওয়া যা পরবর্তী সময়ে অপ্রত্যাশিত আচরণ বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন, বিরতির সময়ের আগে খাবার খাওয়ার অনুমতি দেওয়া, ক্লাসের বাহির পাঠিয়ে দেওয়া।
- পড়ার সময় বেশি সময় লাগলে অন্যরা যেন উত্তর না দিয়ে ফেলে-এমন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা। উত্তর উপস্থাপনার কাজ শুরু করার আগে সব শিক্ষার্থীকে নিয়ম মনে করিয়ে দেওয়া।
- ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীরা যখন একে অন্যকে টিককারি করে, তখন ওই পরিস্থিতিতে কীভাবে সম্মানজনক উপায়ে মত প্রকাশ করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের কাছেই জানতে চাওয়া। এরপর প্রত্যাশিত উপায় বলে দেওয়া। যেমন, কখনো কোনো কাজে বেশি সময় লাগতে পারে, এটা কোনো সমস্যা নয়।
- অন্য সহপাঠীর জন্য ক্ষতিকর আচরণ দেখলে, শিক্ষক দৃঢ় এবং শান্ত গলায় প্রত্যাশিত আচরণের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।
- শ্রেণিকক্ষের ভিতরে বা বাহিরে কিছু সময়ের জন্য আলাদাভাবে থাকতে দেওয়া যাতে সে নিজেকে শান্ত করতে পারে।

প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ নিরসনের কৌশল

১। অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার পূর্বে যেসব কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে সে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি বারবার মনে করিয়ে দেওয়া। নিয়ম সব শিক্ষার্থীদের জন্য একই হতে হবে। নিয়ম মনে করিয়ে দেওয়ার সময় সব শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে তা মৌখিক, ছবি, ইশারা এবং পোস্টারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে যেন সব ধরনের শিক্ষার্থী নিয়মের বিষয়টি সমানভাবে বুঝতে হবে। নিয়মে কোনো পরিবর্তন আসলে সব শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।
- অপ্রত্যাশিত আচরণ করার আগেই ছবি/ভিডিওর মাধ্যমে প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে তা দেখানো। শিক্ষক তার প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণের পোস্টার প্রদর্শন করবেন। যেমন, পোস্টারে ছবির সামনে লেখা থাকতে পারে শিক্ষকের মন দিয়ে শুনি, কথা বলার দরকার হলে হাত তুলে

অপেক্ষা করতে হবে, ক্লাস থেকে বের হবার সময় লাইন ধরে বের হবে, কাজের সময় নিজের সিটে বসে কাজ করি, বইপত্র গুছিয়ে রাখি ইত্যাদি।

- শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত আচরণ করলেই সাথে সাথে তাকে সে আচরণের জন্য প্রশংসা করতে হবে এবং সেই আচরণটিও সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বলে দিবে। যেমন, বলার জন্য কেউ হাত তুললে, শিক্ষক তার প্রশংসা করে বলবেন, তুমি আগে হাত তুলেছ তোমাকে ধন্যবাদ।
- মৌখিকভাবে প্রশংসা করা ছাড়াও অন্যভাবে প্রত্যাশিত আচরণকে উৎসাহিত করা যায়। যেমন, শিক্ষার্থীর খাতায় প্রশংসামূলক মন্ড়ব্য দেয়া, কেউ হাত তুললে তাকে সামনে ডেকে এনে কথা বলার সুযোগ দেয়ার মাধ্যেম প্রত্যাশিত আচরণকে গুরুত্ব দেয়া।

২। অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার সময় যেসব কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

- অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে যাওয়া, এটাও একটা কার্যকরী কৌশল তবে এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে ওই অপ্রত্যাশিত আচরণ যেন কোনো শিক্ষার্থীর সমস্যার কারণ না হয়। যেমন, শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কিছুক্ষণ পরপর কারণ ছাড়া হাত তোলা। তাহলে এই আচরণ এড়িয়ে যাওয়া।
- শিক্ষার্থী যখন অপ্রত্যাশিত আচরণ করে তখন তার আচরণে মনোযোগ না দিয়ে তাকে তার নিজের কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যেমন, ক্লাসের কাজের সময় ক্রমাগত কথা বললে, তার কথা বলা নিয়ে কিছু না বলে কাজের কথা মুখে বলে মনে করিয়ে দেওয়া বা তাকে কি কাজ দেওয়া হয়েছিল তা শুনে নেয়া।
- শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ করলেই তাকে মনোযোগ দেওয়া। যেমন, একজন শিক্ষার্থী হটাৎ করে দাঁড়িয়ে গেল, শিক্ষক তাকে বসতে বললে সে বসে গেল। এই আচরণকে প্রশংসা করে বলা, খুব ভালো। তোমাকে বসতে বলার সাথে সাথে বসে গেলে।

৩। অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার পরে যেসব কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

- অপ্রত্যাশিত আচরণ করলে তার বিপরীতে প্রত্যাশিত আচরণের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া।
- ব্যায়াম/ছবি/ভিড়িও দেখানো যেতে পারে। যেমন, ক্লাসে শোরগোল করলে, শিক্ষার্থীদের শ্বাস ব্যায়াম বা সিট আপ বা সিট ডাউন ইত্যাদি করা যায়।
- শিক্ষার্থীর অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্য অভিযোগ না করে প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষকগণ বা তার অভিভাবকের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে এতে যেন শিশুর উপর নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে।

অধিবেশন-১৭	শিরোনাম: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের ভূমিকা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিখনে বিদ্যালয় ও অংশীজনের সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিখনে বিদ্যালয় ও অংশীজনের একক ও সমন্বিত ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের ভূমিকা	সহায়ক তথ্য-১৭

অংশ-ক: বিদ্যালয় এবং অংশীজনের সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্র এবং ভূমিকা

বিদ্যালয়ের করণীয়

- বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করবে।
- বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশুর সকল শিশুর জন্য শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করবে।
- বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করবে।
- শিশু মারবেন না, তাদের বাড়তি যন্ত নিন। এসব স্লোগান প্রচার করবে।
- শিশু সহায়ক শ্রেণিকক্ষ নিশ্চিত করবে।
- নিয়মিত শিক্ষক-অভিভাবক সভার আয়োজন করবে।
- শিশুদের সংবেধনশীলতা বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করবে।
- শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং সেবা সংস্থাগুলোর সাহায্য নিন।
- শিশুদের বিকাশ, সুরক্ষা এবং অধিকার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করবেন।

- শিশুদের বিকাশ, সুরক্ষা এবং অধিকার নিয়ে মা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক, অভিভাবক সমাবেশ, এসএমসি, হোম ভিজিট ইত্যাদিতে সবাইকে অবহিত করবেন।
- সকল শিশুদের উপযোগী শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করবে।
- বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সকল ধরণের শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিশুর মানসিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অভিভাবক এবং অন্যান্যদের সচেতন করবেন।
- চলাচলে সমস্যাসম্পন্ন শিশু (হুইলচেয়ার, ক্রাচ ব্যবহারকারী) কোনো শ্রেণিতে থাকলে সেই শ্রেণিকে অবশ্যই নীচতলায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে সকল ধরণের শিশুদের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ যেন না হয় সেটা নিশ্চিত করবেন, ইত্যাদি।

শিক্ষকের করণীয়

- উপকরণ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাতে ভারসাম্যতা বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা
- শ্রেণিতে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে, দলনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে, সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর ভূমিকাকে সমানভাবে কাজে লাগানো
- শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বুলিং, উপহাস, কটুক্তি, বঞ্চনা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা স্থাপনে উৎসাহিত করা;
- শিশুদের কাছে শিক্ষাকে সহজ এবং আকর্ষণীয় করা;
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদির (খেলার মাঠ, বসার ব্যবস্থা, পৃথক টয়লেট ব্যবহার, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা) সকল শিক্ষার্থীর জন্য নিশ্চিত করা;
- পাঠ্য বিষয়, ভাষা ও পদ্ধতি সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা উপযোগী করে উপস্থাপন করা।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অবকাঠামো (শিক্ষকের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব) যথা সম্ভব তাদের উপযোগী করতে হবে
- এ সকল শিশুকে অবশ্যই তাদের নিজ নিজ নাম ধরে ডাকতে হবে। অন্য কোনো নেতিবাচক শব্দে ডাকা যাবে না
- তাদের কার কী সমস্যা আছে তা যাচাই বাছাই করে তার জন্য কী করা প্রয়োজন সে পরামর্শ পরিবারের সদস্যদের দিতে হবে। যেমন যদি মনে হয় কোন শিশুর দেখার সমস্যা রয়েছে, তাহলে তার জন্য চশমা কীভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে, যে হাঁটতে পারে না তার জন্য কীভাবে হুইল চেয়ার বা ওয়াকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তা ভাবতে পারেন। সে ব্যাপারে পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন
- সব সময় ধৈর্য্য ধারণ করুন এবং শিশুদেরকে প্রথমে তাদের কথা বা তথ্যটি সম্পূর্ণভাবে বলার জন্য সুযোগ দিন। এতে তারা উৎসাহ পাবে এবং যোগাযোগ করার প্রেরণা পাবে
- কথা বলার সময় তাদের পছন্দমত কথা বা শব্দ ব্যবহারের সুযোগ দিন। বার বার ভুল ধরবেন না। তাহলে সে কথা বলতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে
- অনেক সময় তোতলা বা অন্য কারণে লজ্জায় কিছু কিছু শিশু যোগাযোগ করতে চায় না। সেক্ষেত্রে এদের লজ্জা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন: শুরুতে তাদের পছন্দমত একজন বা দু'জনের সাথে কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে

- যে সকল শব্দ বা উচ্চারণ বলতে বেশী সমস্যা হয় অন্য শিশুদের সহায়তায় সেগুলি বেশী করে অনুশীলন করাতে হবে। এক্ষেত্রে শব্দের খেলা জাতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে
- মুখের কিছু কিছু ব্যায়াম করানো যেতে পারে। তাকে সাবান পানি গুলিয়ে সেই পানিতে পাটকাঠি দিয়ে ফুঁ দিতে বলা। ফুঁদিয়ে বল তৈরি করা। একটি বা দুটি স্বরবর্ণ বার বার কয়েকদিন ধরে উচ্চারণ করতে দেয়া; পারলে তার অন্য স্বরবর্ণগুলোও উচ্চারণ করতে দেয়া
- পাঠের বিষয়গুলি যথাসম্ভব বোর্ডে লিখে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিদিনের দৈনিক পাঠসূচি দিনের শুরুতেই শ্রেণিকক্ষে লিখে দেয়া যেতে পারে
- শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ছবি/চিত্র/অংকন/মডেল এ জাতীয় উপকরণ ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে
- সব সময় শিশুদের দিকে সরাসরি মুখ করে পাঠদান করতে হবে। কথা বলার সময় ঠোঁটের কাজগুলি বুঝতে দিতে হবে
- সরল, সহজবোধ্য এবং সাবলীল ভাষায় পাঠদান করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কথার পূনরাবৃত্তি করতে হবে যাতে এ সকল শিশুর বুঝতে কোন সমস্যা না হয়
- শ্রবণে সমস্যার কারণ হয়তো কানে কম শোনা বা না শোনা। শিশুটির পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন তারা শিশুটির কান পরীক্ষা করে দেখেন সমস্যা কতটুকু। এমন হতে পারে একটি শ্রবণযন্ত্র দেয়া গেলে শিশুটির সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে
- দৃষ্টি সমস্যা জনিত শিশুদের অন্য শিশুর সাথে সামনের সারিতে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পূর্ণদৃষ্টি সম্পন্ন শিশু যেন তার পাশে থাকে। ফলে কোন লেখা দেখতে অসুবিধা হলে সে তার কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে
- দৃষ্টিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি শিশুদের স্পর্শের মাধ্যমে শেখানো খুবই সহজ। এর জন্য স্পর্শ করার মত উপকরণ তৈরি করে নেয়া যায়। সে ধরনের উপকরণ তৈরি করা কোন কঠিন বিষয় নয়। বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়
- স্কুলের আঙিনায় মাটিতে গভীর করে বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি দিয়ে লেখা (অক্ষর, সংখ্যা, ছবির ধারণা, বিভিন্ন জিনিসের ছবি) শেখানো যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে সহপাঠিদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে
- চলাচলে সমস্যাসম্পন্ন শিশু (হুইলচেয়ার, ক্রাচ ব্যবহারকারী) কোনো শ্রেণিতে থাকলে সেই শ্রেণিকে অবশ্যই নীচতলায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে
- ছড়া, কবিতা ইত্যাদি বেশী বেশী অনুশীলনের মাধ্যমে এদের উচ্চারণ সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে
- পাঠের বিষয়কে বা লেসনকে বেশি বড় না করে যথাসম্ভব ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে পাঠ দিতে হবে। এতে সকল শিশুরা সহজে শিখতে পারবে। ধীরে ধীরে পাঠের বিষয়কে বা লেসনকে বড় করা যেতে পারে
- সব সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং শিশুর কথা সম্পূর্ণভাবে বলার সুযোগ দেওয়া, এতে তারা উৎসাহ পাবে এবং যোগাযোগ করার প্রেরণা পাবে
- প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যাওয়া এবং আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান করা
- পাঠদান শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এবং কর্মভিত্তিক হবে।
- অকৃতকার্যের জন্য তিরষ্কার করা যাবে না এবং যথাসম্ভব বিষয়টি শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে
- অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে
- অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে

- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে শিশুদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বাবা-মাকে পরামর্শ দেয়া।

শিক্ষার্থীদের করণীয়

- সহপাঠী শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বুলিং, উপহাস, কটুক্তি, বঞ্চনা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে করবে না;
- সকল শিক্ষার্থীর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাথে বুন্ধুত্ব গড়বে
- সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে
- বাবা-মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে সহায়তা করবে
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে সামনের সারিতে বসতে দিবে
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে কথা বলার সময় বাধা দিবে না
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে কখনো প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক বলবে না

অভিভাবকের করণীয়

- শিশুদের সকল বাধা অতিক্রম করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ভালো ব্যবহার কীভাবে করতে হয় সেসব শিখাবেন
- শিশুদের সহমর্মী এবং সহযোগিতা করতে শিখাবেন
- নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া নিশ্চিত করবেন
- শিক্ষকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবনে
- নিজের শিশুর সমস্যা শিক্ষককে পূর্বেই অবহিত করবেন
- ধৈর্য ধারন করতে হবে এবং বারবার চেষ্টা করতে হবে
- আন্তরিকতা বাড়াতে হবে
- মানিয়ে নিবার মানসিকতা বৃদ্ধি করতে হবে
- অন্য সহপাঠীদের সাথে বুন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে হবে
- অবহেলা কমিয়ে দিতে হবে

অন্যান্য অংশীজন (স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান) করণীয়

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প তৈরি করে দিবেন
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়োজনে হুইলচেয়ার, ক্রাচ ইত্যাদি সরবরাহ করে দিবেন
- বিদ্যালয়ে গমনের জন্য সকল প্রকারের বাধা দূর করার ব্যবস্থা করবেন
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অসমতার কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন, ইত্যাদি।

তথ্যপুস্তক

অধিবেশন-১৮	শিরোনাম: শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে খেলার ভূমিকা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের মৌলিক ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর মানসিকভাবে ভাল থাকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে খেলা কীভাবে ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে খেলার ভূমিকা	সহায়ক তথ্য-১৮

অংশ-খ:

খেলা কীভাবে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে?

- **শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ইতিবাচক অনুভূতি বাড়ায়:** বেশিরভাগ ধরনের খেলায় শারীরিক ক্রিয়াকলাপ জড়িত। গবেষণায় দেখা যায়, খেলা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ শারীরিক ক্রিয়াকলাপ দেহে প্রাকৃতিক এন্ডোরফিন বাড়ায় যা শিশুদের আত্মসম্মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- **খেলা শিশুদের দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করতে শেখায়:** কল্পনাপ্রসূত খেলা শিশুদেরকে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির কাছে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ এবং স্বাধীনতা দেয়। দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করে কীভাবে সমাধানে পৌঁছাতে হয় তা শিখতে খেলা ভুমিকা পালন করতে পারে। বাস্তব জীবনে যেকোনো অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি উপস্থিত হলে তা মোকাবিলা করতে ব্যক্তিকে সাহসী করে তুলতেও খেলা ভূমিকা পালন করে।
- **খেলা শক্তি ব্যয় করার একটি ভাল সুযোগ:** শিশুরা কখনো কখনো নেতিবাচকতা, রাগ বা উদ্বেগের মত

শক্তিশালী আবেগগুলোকে নিজেদের মাঝে ধরে রাখে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এই অনুভূতিগুলো ব্যবহার করার জন্য সক্রিয় খেলা শিশুদেরকে ভালো সুযোগ করে দেয়। শিশুরা যখন স্বাধীনভাবে তাদের আবেগ প্রকাশ করতে পারে, তখন তাদের সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মক আচরণে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কমে যায়।

- **খেলা শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠায় ভূমিকা রাখে এবং প্রশান্তি দেয়:** শৈশবকালে খেলা প্রতিটি শিশুকে তাদের ক্ষমতা নির্বিশেষে একসাথে আসার সুযোগ তৈরি করে দিয়ে সামাজিক সংযোগ স্থাপনে ভূমিকা পালন করে। খেলার মাধ্যমে শিশু অন্যদের সাথে মিল খুঁজে পায় যা শিশুকে সামাজিক পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সাহায্য করে।

তথ্যপুস্তক

অধিবেশন-১৯	শিরোনাম: শিশুর আবেগ ব্যবস্থাপনা ও আত্মপরিচর্যা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. আবেগ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা সমূহ ব্যাখা করতে পারবেন;
খ. নিজেদের ও অন্যদের আবেগসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ. নিজেদের আবেগ ব্যবস্থাপনা চর্চার কৌশলসমূহ ব্যাখা করতে পারবেন;
ঘ. শিশুর মন ভাল রাখার কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

আবেগ ব্যবস্থাপনার কৌশল ও আত্মপরিচর্যা	সহায়ক তথ্য-১৯

অংশ-খ: সহায়ক তথ্য:

আবেগ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ

- মননশীলতা এবং গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস
- আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করুন
- মানসিক চাপ হ্রাস করুন (পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম করুন, কাজের অগ্রাধিকার সেট করুন, নিজের এবং অন্যের জন্য সহমর্মিতা দেখান, মননশীল ক্রিয়াকলাপ করুন, সাহায্য নিন)
- সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী করুন
- অন্যের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন
- মানুষের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন

- ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখার অনুশীলন করুন
- আত্ম-সচেতনতার অনুশীলন করুন
- নিজের আবেগ অনুভূতিগুলো পর্যবেক্ষণ করুন

আত্মপরিচর্যা

আত্মপরিচর্যার অর্থ হলো নিজের জন্য কিছু করা। কিছু সময় বের করে নিজের জন্য অর্থপূর্ণ কিছু করাকেই আত্মপরিচর্যা বলে। আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছায় ও উদ্যোগ নিয়ে নিজেকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার নাম হলো আত্মপরিচর্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আত্মপরিচর্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে, 'নিজের যত্ন হলো ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের সেই সক্ষমতা যা স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াই স্বাস্থ্যের উন্নয়নে, রোগ প্রতিরোধে, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে, অসুস্থতা ও অক্ষমতার সাথে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।'

আত্মপরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা

- জীবনের সন্তুষ্টি বাড়ানো: আত্মপরিচর্যা ব্যক্তির জীবনে আনন্দদায়ক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে ব্যক্তির জীবনের প্রতি সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় ও জীবনমান উন্নত হয়। আর নিজে সন্তুষ্ট থাকলে সে অন্যদের সাথেও ভালোভাবে মিশতে পারে এবং যেকোনো কাজ আরো দক্ষতার সাথে করতে সক্ষম হয়।
- অন্যের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা: আত্মপরিচর্যার একটি লক্ষ্য হচ্ছে নিজের জন্য অনিষ্টকর বিষয়গুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখা। অনেক সময় আমাদের চারপাশের মানুষের মাঝে এমন কিছু ব্যক্তি থাকে, যারা আমাদের অবমূল্যায়ন করে কিংবা যাদের উপস্থিতিতে আমরা অস্বস্তিবোধ করি বা খারাপ অনুভব করি। আত্মপরিচর্যার মাধ্যমে ব্যক্তি এ ধরনের খারাপ লাগাকে কাটিয়ে বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থতা নিশ্চিত করা: যখন আমরা নিজের প্রতি যত্ন নেই তখন নিজের ভালোলাগা-মন্দলাগা এসবের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি। নিজেকে একটু সময় দিয়ে নিজের মনের মতো কোনো কাজ করে আমরা আমাদের মনকে ভালো রাখতে পারি আর মন ভালো থাকলে আমাদের শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।
- মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা: দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকি। যখন চাপের মাত্রা বাড়তে থাকে তখন চাপ মোকাবেলা করতে করতে এমন এক পর্যায় যেয়ে পৌঁছাই যে সামান্য চাপও আমরা আর মোকাবেলা করতে পারি না। এরকম পরিস্থিতিতে নিয়মিত নিজের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের মানসিক চাপ, অস্থিরতা, ভয়, আশঙ্কা, মন খারাপ ইত্যাদি নেতিবাচক অনুভূতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব।
- কর্ম দক্ষতা বাড়ানো: যখন আমরা নিজে ভালো থাকি তখন আমরা আমাদের কাজগুলো আরও বেশি

দক্ষতার সাথে করতে পারি।

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: নিয়মিত নিজের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা আরও বেশি সচেতন হতে পারি। নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম, স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ইত্যাদি আমাদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি করে, তেমনি কোনো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তা তাড়াতাড়ি শনাক্ত করতে এবং চিকিৎসা নিতেও সাহায্য করে। এছাড়া শরীর ভালো থাকলে তা মন ভালো রাখতে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

মনের যত্নে আত্ম-পরিচর্যামূলক অনুশীলন শুরু করার ধাপসমূহ

- কী অর্জন করতে চাই তা চিহ্নিতকরণ
- যেসব ব্যক্তি বা বিষয় বর্জন করতে হবে তার তালিকা তৈরি
- কাজে চাপ কমানো ও নিজেকে আনন্দ দেওয়ার সুযোগ প্রদান
- নিজের মনের কথা শোনা ও প্রতিটি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের মাঝে আত্ম-পরিচর্যার সুযোগ খোঁজা
- সফলভাবে একটি কাজ করতে পারলে নিজেকে প্রশংসা করা

মনের যত্নে আত্ম-পরিচর্যার উপায়সমূহ

আত্ম-পরিচর্যামূলক কাজসমূহ নানাভাবে করা সম্ভব। এধরনের কিছু কাজের উদাহরণ হলো:

- পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও পর্যাপ্ত ঘুম এগুলো নিজের জন্য অতি প্রয়োজনীয়
- প্রতিদিন কিছু সময় ব্যায়াম করা অথবা হাঁটা
- কাজের ফাঁকে অল্প সময়ের জন্য হলেও বিশ্রাম নেয়া
- কাছের কোন বন্ধু-বান্ধব অথবা প্রিয় মানুষের সাথে সময় কাটানো, নিজের মনের কথা শেয়ার করা
- নিজেই নিজের প্রশংসা করা, নিজেকে বাহবা দেওয়ার মাধ্যমে উৎসাহিত করা
- অল্প পরিসরে নিজের পছন্দের কোন কাজ করা, যেমন- বই পড়া, গান শোনা, নাটক বা সিনেমা দেখা বা ছবি আঁকা ইত্যাদি
- রিল্যাক্সেশন/শিথিলায়ন অনুশীলন করা

আত্ম-পরিচর্যায় মাইন্ডফুলনেস

মাইন্ডফুলনেস হলো বর্তমানের প্রতি পুরোপুরি সচেতন থাকা, আমরা কোথায় আছি, কী করছি সে সম্পর্কে সচেতনতা। মাইন্ডফুলনেস অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের শারীরিক, আবেগীয় ও মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে আরও সচল রাখতে পারি। আমরা যদি প্রতিদিন ২/৩ বার করে এই অনুশীলন করি তবে তা আমাদের বর্তমানের প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করবে এবং মনকেও ভালো রাখবে।

মাইন্ডফুলনেস অনুশীলন

- প্রথমে আরাম করে বসে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করুন। (আপনি চাইলে চোখ খোলা রেখেও অনুশীলনটি করতে পারেন)। এরপর শ্বাসের দিকে গভীর মনোযোগ দিন। নাক দিয়ে বড় করে শ্বাস নিন, এরপর মুখ দিয়ে শ্বাস বের করে দিন। এভাবে কয়েকবার শ্বাস নিন এবং শ্বাস ছাড়ুন।
- মনে করুন- আপনি যখন শ্বাস নিচ্ছেন তখন ঠান্ডা সুবাতাস আপনার নাক দিয়ে ঢুকে পেট পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। আপনি যখন শ্বাস ছাড়ছেন, তখন আপনার সব দুঃখ-কষ্ট, টেনশন, কাজের চাপ, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা শ্বাসের সাথে বের যাচ্ছে। আপনার অনেক আরাম লাগছে।
- মনে করুন- আপনি একটি বাগানে নরম সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। নরম সবুজ ঘাসের কোমল স্পর্শ আপনি আপনার পায়ে অনুভব করছেন। মৃদু ঠান্ডা বাতাস আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে। আপনার অনেক শান্তি লাগছে। বাগানে ফুটে আছে আপনার পছন্দের সব ফুল। বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আপনার অনেক ভালো লাগছে। আপনার চারিদিকে অনেক পাখি, পাখির কিচির-মিচির শুনতে পাচ্ছেন। আপনার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। এবার এই সুন্দর পরিবেশে আরও কিছুটা সময় নিয়ে ভালো লাগা এবং প্রশান্তি অনুভব করুন। আরও কিছুটা সময় নিজের সাথে কাটান। এরপর এই ভালো লাগা এবং প্রশান্তি সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে সেশনে ফিরে আসুন এবং চোখ খুলুন।

পেশি শিথিলায়ন খেলার (Progressive Muscular Relaxation) নিয়মাবলিঃ

এক বনে এক বদরাগী বাঘ ছিল। তার অত্যাচারে বনের সকল পশুপাখি অতিষ্ঠ ছিল। সবাই মিলে একটা মিটিং এ বসল। সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিয়াল পণ্ডিতের কাছে গেল এর সমাধানের জন্য। কারণ শিয়াল ছিল বনের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী কোন সমস্যায় পড়লে শিয়াল সমাধান দেয়। সবকিছু শুনে শিয়াল তাদের আশ্বস্ত করল সে বিষয়টা দেখবে কিভাবে বাঘের রাগ কমানো যায়।

শিয়াল বাঘের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখে একটা বুলবুলি পাখি হঠাৎ করে বাঘের সামনে দিয়ে উড়ে চলে যাওয়ায় কিছু বালি বাঘের চোখে যায়, এতে বাঘ রাগে ইইইইইইইইই করতে থাকে (আমরা সবাই এমন করে অভিনয় করে)।

শিয়াল সামনে গিয়ে দাঁড়াতে শিয়ালকে দেখে বাঘ একটু শান্ত হল। অন্য সবার মতো বাঘেরও শিয়ালকে ভীষণ পছন্দ, তার উপর আস্থা ছিল যে সে তার রাগ কমাতে পারবে। বাঘ শিয়ালকে বলে ভাগ্নে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে কিছু একটা করো আমার জন্যে।

শিয়াল: বাঘ মামা আমি বুঝতে পারছি তোমার অনেক রাগ হচ্ছে এবং তোমার রাগ হওয়াটাও এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত। একটা উপায় আছে তোমার রাগ কমানোর সেটা হল মাংসপেশী শিথিল এর অনুশীলন।

বাঘ: জলদি বল আমাকে কি করতে হবে তার জন্যে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এই পুঁচকে

পাখিটার এত বড় সাহস আমার চোখে বালি দিয়ে উড়ে গেছে।

শিয়াল: চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে লম্বা করে দম নিয়ে মনে মনে ১-৩ পর্যন্ত গণনা হলে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেই। এভাবে তিন বার করে করি।

- এবার চোখ বন্ধ করে কল্পনা করি একটা দুষ্টু পাজি মাছি এসে আমার কপালে বসেছে। মাছিটাকে হাত না লাগিয়ে তাড়াতে হবে, কপাল কুঁচকে মাছিটাকে তাড়িয়ে দিয়ে কপাল শিথিল করব। এবার সেই মাছিটা এসে নাকের উপর বসেছে। এবারো মাছিটাকে হাত না দিয়ে নাক কুঁচকে তাড়িয়ে দিব।
- এরপর আমরা আড়মোড়া ভাঙার মতো করে হাত দুটোকে এমনভাবে উপরের দিকে টান টান করে তুলব যেন মনে হয় আমি গাছের একদম উপরের ডাল ধরছি। এবার ধীরে ধীরে হাত নামাই।
- এবার আমাদের ডান হাতটা উপর দিকে তুলে মনে করি আমাদের ডান হাতে একটি লেবু রয়েছে। ডান হাত দিয়ে লেবুটাকে চিপে লেবুর রসটা বের করি, ১-২, ১-২, ১-২। ডান হাত নামাই। এবার বাম হাতটা উপর দিকে তুলে ধরে একইভাবে বাম হাত দিয়ে লেবুর রস বের করি ১-২, ১-২, ১-২। এবার আমরা দুই হাত উপরের দিকে তুলে ধরি এবং দুই হাত দিয়ে লেবুর রস বের করি ১-২, ১-২, ১-২।
- আমরা তো কচ্ছপ দেখেছি, তাই না? কচ্ছপের মাথায় টোকা দিলে কচ্ছপ মাথাটাকে ভেতরের দিকে নিয়ে যায়। আমরা একসাথে দুই ঘাড়কে উপরে নিচে নামিয়ে কচ্ছপের মত করি ১-২, ১-২, ১-২।
- এবার কল্পনা করি আমাদের সামনে একটি অদৃশ্য দেয়াল রয়েছে, সেই দেয়ালটাকে আমরা সবাই মিলে সামনের দিকে ধাক্কা দিব। কিন্তু আমরা নিজেদের জায়গা থেকে নাড়াচাড়া করব না বা পড়ে যাব না। আমরা এখন একসাথে সজোরে ধাক্কা দেই দেয়ালকে। (ইয়াআআআআআআআ)
- এখন আমরা বিভিন্নভাবে হাসব। প্রথমে হাহা করে সবাই হাসি। এরপর হো হো করে হাসি। এবার হিহি করে হাসি।
- এবার কল্পনা করি আমরা বনে আরাম করে শুয়ে আছি, আর একটি হাতি আসছে আমাদের দিকে। কিন্তু আমাদের উঠতে মন চাচ্ছে না। আমরা আমাদের পেটটা এমনভাবে শক্ত করে গুটিয়ে শুয়ে থাকি যাতে আমাদের না দেখা যায়। এভাবে কিছুক্ষণ থাকি। হাতি আমাদেরকে না দেখেই চলে গেল।
- এবার মনে করি আমাদের পায়ে কাদা মাটি লেগেছে। এবার আমরা পা থেকে কাদামাটি ছাড়ানোর চেষ্টা করি পায়ের আঙ্গুলগুলো নাড়াচাড়া করে।

শিয়াল: মামা কেমন লাগলো?

বাঘ: আমার তো অনেক আরাম লেগেছে। মনে হচ্ছে রাগ অনেকটাই কমে গিয়েছে।

শিয়াল: মামা তুমি এই ব্যায়াম নিয়মিত করবে, তাহলে দেখবে তুমি মানসিক চাপ বা রাগের সময় শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ:

- **অধিবেশন-১:**

১. 'শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন' বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সহায়িকা, (জানুয়ারি ২০২৩); ডিপিই, প্রাগম, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

২. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড)

৩. Retrieved from- http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2877/Unit-05.pdf

- **অধিবেশন-২:**

১. পেশাগত শিক্ষা, (প্রথম খন্ড), ডিসেম্বর ২০১৯, ডিপিএড তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ।

২. https://www.unicef.org/bangladesh/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE

৩. http://scouts.portal.gov.bd/sites/default/files/files/scouts.portal.gov.bd/page/4bb78da6_18ec_4458_8d7c_3caf607b9ee6/Scouter%20%26%20Parents-%20joint%20policy%20for%20developing%20children%20as%20good%20citizen.pdf

৪. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1119.html

- **অধিবেশন-৩:**
  ১. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের আদর্শিক মান (২০২০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও ইউনিসেফ।
  ২. 'শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন' বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সহায়িকা, (জানুয়ারি ২০২৩); ডিপিই, প্রাগম, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
  ৩. Retrieved from- http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2877/Unit-05.pdf

- **অধিবেশন-৪:**
  ১. দ্য ল্যানসেট সিরিজ-১, ২০০৭, DOI: 10.1016/S0140-6736(07)60076-2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17223478/
  ২. Nurturing Care Framework, UNICEF, 2018
  ৩. 'শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন' বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সহায়িকা, (জানুয়ারি ২০২৩); ডিপিই, প্রাগম, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

- **অধিবেশন-৫:**
  ১. Experiences Build Brain Architecture, Center on the Developing Child by Harvard University
  ২. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পরিমার্জিত ও সংশোধিত: মার্চ ২০১৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

- **অধিবেশন-৬:**
  ১. Trawick-Smith, J. (2006) Early Childhood Development: A Multicultural Perspective (4th Edition). New Jersey: Pearson/Merrill/Prentice Hall. Ecological systems theory derived from https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_systems_theory

- **অধিবেশন-৭:**
  ১. Gardner, H. (2011). Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books.)
  ২. Hanson, K.A., Kaufmann, R.K., & Saifer, S. (1996).Education and the culture of democracy: Early childhood practice. New York, NY:Open Society Institute.

- **অধিবেশন-৮:**

১. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) (২০২০) পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড) তথ্যপুস্তক, ময়মনসিংহ।

- **অধিবেশন-৯:**

১. Trawick-Smith, J. (2006) Early Childhood Development: A Multicultural Perspective (4th Edition). New Jersey: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
২. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০২৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড)

- **অধিবেশন-১০:**

১. https://cms.learningthroughplay.com/media/esriqz2x/role-of-play-in-childrens-development-review_web.pdf
২. https://learningthroughplay.com/explore-the-research/child-development-through-play

- **অধিবেশন-১১:**

১. https://www.classghar.com/2022/08/write-the-characteristics-co-curricular-activities.html
২. http://debatejudo.blogspot.com/p/blog-page_7.html
৩. শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সহায়িকা (জানুয়ারি ২০২৩); ডিপিই, প্রাগম এবং ব্র্যাক আইইডি

- **অধিবেশন-১২:**

১. জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি, এনসিটিবি (২০২২)।
২. https://eshikhon.com.bd/unit/class-six-grahostha-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B6-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F/
৩. মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ (২০১০), ড. উত্তম কুমার দাশ এবং ড. অনিমা রাণী নাথ, উপমা প্রকাশন, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
৪. https://dmpnews.org/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A7%AB-%E0%A6%97%E0%A7%81/

৫. কৃষি তথ্য সার্ভিস, গণপ্রজাত্রী বাংলাদেশ সরকার:
http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8%E0%A7%A9/%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3/%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%20%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B2%20%E0%A6%93%20%E0%A6%8F%E0%A6%B0%20%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC

- **অধিবেশন-১৩:**
  ১. মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ (২০১০), ড. উত্তম কুমার দাশ এবং ড. অনিমা রাণী নাথ, উপমা প্রকাশন, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত ঢাকা-১২০৫
  ২. প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা, ডিপিএড, পেশাগত শিক্ষা (২য় খন্ড), তথ্যপুস্ড়ক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ, ডিসেম্বর ২০১৯
  ৩. https://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/OSMBA/osmba_111/Unit-09.pdf

- **অধিবেশন-১৪:**
  ১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং সুচনা ফাউন্ডেশন (২০২২), একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন।
  ২. রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১), মডিউল-এম ৭০৬, শিশু ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
  ৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (১ম খন্ড)।
  ৪. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), ঢাকা (২০১৪), একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

- **অধিবেশন-১৫:**
  ১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং সুচনা ফাউন্ডেশন (২০২২), একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন।

২. রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১), মডিউল-এম ৭০৬, শিশু ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (১ম খন্ড)।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), ঢাকা (২০১৪), একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

- **অধিবেশন-১৬:**

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং সুচনা ফাউন্ডেশন (২০২২), একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন।
২. রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১), মডিউল-এম ৭০৬, শিশু ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (১ম খন্ড)।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), ঢাকা (২০১৪), একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

- **অধিবেশন-১৭:**

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং সুচনা ফাউন্ডেশন (২০২২), একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন।
২. রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১), মডিউল-এম ৭০৬, শিশু ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (১ম খন্ড)।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), ঢাকা (২০১৪), একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।
৫. http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2877/Unit-08.pdf
৬. https://www.ekushey-tv.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F/70628

- **অধিবেশন-১৮:**

১. মোহিত কামাল (২০০২) শিশুর মনোজগত, শিশুর বেড়ে ওঠা। বিদ্যাপ্রকাশ

- **অধিবেশন-১৯:**

২. মেহ্‌জাবীন হক (২০১৪) কৈশোরের যতকথা বালুকণা থেকে মুক্তা। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

৩. রাউফুন নাহার (২০২০) মনের যত্ন। অনিন্দ্য প্রকাশ